ভূতের গল্প সংকলন
১
সম্পাদনাঃ শিশির শুভ্র

ভূতের গল্প সংকলন

-১-

সম্পাদনা: শিশির শুভ্র

www.shishukishor.org

উৎসর্গ

জগতের সকল শিশু-কিশোরদের
যারা বই পড়তে পছন্দ করে
www.shishukishor.org

কপিরাইট

এই সংকলনে যা আছে...

পটলা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছেলে পটলাকে নিয়ে খটিক দাসের বড় মুশকিল যাচ্ছে। পটলার মোটে আট বছর বয়স, কিন্তু বাড় নাই, রোগা ডিগডিগে। লেখাপড়া বা খেলাধুলো করবে কী, বারো মাস তার আমাশই সারতে চায় না। ডাক্তার, কবিরাজ দেখিয়ে খটিক হদ্দ। এক সকালে নন্দমেসো এসে বললেন, "বুঝলি খটিক, হাটমদনপুরের রাজবাড়ির পুরনো ইঁদারার জল যদি সাতদিন খাওয়াতে পারিস, তা হলে দেখবি, পটলা ফের ঝাঁকি মেরে উঠবে। ওঃ কী জল রে বাপু, কী জল! পেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গায়ে বল এসে পড়ে। তবে খরচা আছে, সেখানে গিয়ে কয়েকটা দিন থাকতে হবে।"

তা খটিকের টাকার অভাব নেই, চার-পাঁচটা গাঁ জুড়ে তার পাইকারি কারবার। চালকল আছে, তেলতল আছে। তাই দানোমোনো করে খটিক মনস্থির করে ফেলল।

হাটমদনপুর খুব কাছে পিঠে নয়। লোক পাঠিয়ে সেখানে একটা বাসা ভাড়া করে ফেলল সে। তারপর একদিন পটলা আর পটলার মা কুসুমকে নিয়ে হাজির । বাড়িখানা বেশ সাবেক আমলের। চারখানা ঘর, দারদারান, ঠাকুর ঘর, ভাঁড়ারঘর, সামনে বারান্দা, চাতাল, চারিদিকে আগাছায় ভরা বাগান এসব আছে। রাজবাড়িও কাছেই। ভারী দিয়ে সেখানকার জল আনানোরও ব্যবস্থা হল। পটলা বুঝতে পারছে, তার জন্যই এত সব আয়োজন হচ্ছে। তার শরীর ভাল নয়। শরীর খারাপ বলে তার খেলাধুলো বারণ, দৌড়ঝাঁপ বারণ। কাঁচকলা দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল আর দই ছাড়া কিছু খাওয়া বারণ। আর এই জন্যই পটলার

মনও ভাল না। যে শুধু চুপচাপ জানালার ধারে বসে বাইরের গাছপালা, কগবগ দেখে। সময় কাটতে চায় না।

দুপুরবেলা একদিন পটরা বাড়ির মধ্যেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিরাট বড় বাড়ি, বড়-বড় সব তালাবদ্ধ ঘর। তালায় মরচে পড়ে গিয়েছে। ঘুরতে-ঘুরতে সে দরদালানের শেষ প্রান্তে এসে ডান দিকে একটা অন্ধকার মতো গলিতে ঢুকে ধমকে দাঁড়াল। ডান দিকে একটা একটেরে ঘর। তার দরজাটা ভেজানো, ভিতর থেকে হামানদিস্তার শব্দ আসছে।

পটলা গিয়ে দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে পেল, একজন বুড়ো মানুষ একটা টেবিলের উপর লোহার ছোট হামানদিস্তায় কী যেন গুঁড়ো করছে। এ বাড়িতে কেউ থাকে বেলে জানা ছিল না তার। সে একটু অবাক হল। বুড়ো লোকটা হঠাৎ দরজার দিকে চেয়ে একগাল হেসে বলে,“বাইরে দাঁড়িয়ে কেন রে পটল? ভিতরে আয়। তোর জন্যই ওষুধ করছি।”

পটল আরও অবাক, বুড়ো তার নামও জানে যে! ভিতরে ঢুকে সে দেখতে পেল চারদিকের তাকে নানারকম শিশির বোতল সাজানো। আর ঘরটার মধ্যে একটা বেশ কবিরাজি ওষুধের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। পটলা বুড়োর মুখোমুখি একটু টুলে জড়সড় হয়ে বসে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কে বলো তো?” সাদা দাড়িগোঁফের ফাঁক ফাঁক দিয়ে ফিক করে একটু হেসে লোকটা বলে, “আমি হলুম গে হেমেন সাধুখাঁ, আয়ুর্বেদাচার্য। কি বুঝলে?”

মাথা নেড়ে পটলা বলল, “না তো! তুমি কি এই ঘরেই থাকো?”

“তা আর কোথায় থাকব বলো?”

“কিন্তু এ বাড়িতে তো আর কেউ থাকে না।”

তা হলে আমি আছি কী করে? নাও তো বাবা, এবার এই খল থেকে ওষুধটা ঢক করে খেয়ে নাও।”

বুড়ো লোকটা হামানদিস্তা থেকে গুঁড়োটা খলে ঢেলে কী একটা পাতার রস মিশিয়ে তাকে দিল।

পটল ভয় পেয়ে বলে, "তেতো নয় তো?"

"আরে না। মধু মেশানো আছে।"

ওষুধটা খেতে বেশ লাগল পটলার।

"আমি কি ভাল হব?"

"খুব হবে।"

"খেলতে পারব?"

"তা না পারবে কেন?"

"পড়াশুনা?"

"তাও হবে। রোজ এ সময়টা এসে ওষুধ খেয়ে যেও। আর শোনো, আমার কথা মা-বাবাকে বলতে যেও না যেন!"

"ঠিক আছে।"

লোকটা বলল,"এবার যাও। কাল আবার এ সময় চলে এসো।"

পটলা টুকটুক করে নিজের ঘরে ফিরে এল। দুপুরে তার খুব খিদে হল। রোজ একমুঠো ভাত খায় সে, আজ ভাত নিয়ে খেল। রাতের বেলা সে রোজ যা খায়, তার ডবল খেয়ে ফেলল।

খটিক কুসুমকে বলল,"জলের তো গুণ আছে দেখছি"

কুসুম ধমক দিয়ে বলল, "ওসব বলতে নেই। নজর লাগবে।"

পরদিন দুপুরে পটলা ফের সেই ঘরে গিয়ে হাজির। বুড়ো মানুষটা তাকে দেখে খুব খুশি। ওষুধ খাইয়ে দিল যত্ন করে। তারপর বলল,"এ বাড়িটা একসময় আমারই ছিল, বুঝলে?"

"এখন নেই?"

“না, এখন আর বাড়িঘরের দরকারও হয় না। দিব্যি আছি।”

“কাল থেকে আমার খুব খিদে পাচ্ছে”

“পাবেই তো। পাওয়ারই কথা।”

বাবা বলছিলেন,“পুরনো ইঁদারার জলেই নাকি গুণ!”

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, “তোমাকে বলেছে!দুর দুর, জলের কোন গুণ নেই। ওষুধের গুণ।”

“বাবাকে বলব?”

“খবরদার না।”

সাতদিনের মধ্যেই পটলার শরীর সেরে উঠল। সে দিব্যি গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে লাগল, এমনকী ফুটবল, হাডুডু খেলতেও মেতে গেল। দেখে খটিক আর কুসুম খুব খুশি।

খটিক কুসুমকে বলল,“ভাবছি, ইঁদারাটা ইজারা নিয়ে ওর জল শিশিতে করে বিক্রি করব। কেমন হবে বলো তো?”

“তা বাপু জলের গুণ আছে, স্বীকার করতেই হবে।”

ঠিক এই সময় আড়াল থেকে একটা গলাখাঁকারির শব্দ পাওয়া গলে, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

খটিক অবাক হয়ে বলে,“কে কাশল যেন?”

পটলা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছবির বই দেখছিল, বলল,“ও তো হেমেনদাদুর কাশির শব্দ।”

“হেমেনদাদু! সে আবার কে?”

ওই যে বাড়ির পেছন দিককার ঘরটায় থাকে। হেমেনদাদুই তো আমাকে রোজ ওষুধ খাইয়ে ভাল করে দিয়েছে।

খটিক আর কুসুম অবাক হয়ে মুখ তাকাতাকি করে বলে,“বাড়ির পিছনে আবার কে থাকে? আমরা তিনজন ছাড়া এ বাড়িতে তো কেউ নাই!”

“বাঃরে, হেমেনদাদুর ঘরে তো আমি রোজ ওষুধ খেতে যাই!”

“চল তো দেখি কেমন তোর হেমেনদাদু?”

মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে পটলাও একটু অবাক। সেখানে হেমেন সাধুখাঁর ঘরটা থাকার কথা সেখানে এখন নিরেট দেওয়াল।

সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,“এখানেই তো ঘরটা ছিল।”

“ছিল তো গেল কোথায়? ঘরতো আর মানুষ নয় যে উড়ে যাবে!”

“বাঃ রে, হেমেনদাদু যে আমাকে ওষুধ দেয়। সেই ওষুধ খেয়েই তো আমার অসুখ সেরেছে।”

খটিক আকাশ থেকে পড়ে বলে “হেমেনদাদু তোকে ওষুধ দেয় কি করে? নিশ্চয় স্বপন দেখেছিল। তোর অসুখ তো সেরেছে ইঁদারার জলে।”

পটলা কী আর করে। চুপ মেরে গেল।

পরদিন দুপুরে গিয়ে সে একা ঠিক ঘর খুঁজে পেল।

“হ্যাঁ দাদু, কাল তোমার ঘরটা খুঁজে পেলাম না কেন বলো তো?”

একগাল হেসে হেমেন সাধুখাঁ বলল,“প্রায় ধরিয়ে দিয়েছিলি আর কী!”

“তোমার ধরা পড়ার ভয় কেন দাদু?”

“সে অনেক কথা, তোর অত শুনে দরকার নেই। তবে তোর বাবাকে বলিস, ইঁদারার জলে আর আগের মতো কাজ হয় না। কেন জানিস? ওই ইঁদারার মধ্যে এক সময় আমিই থাকতাম কিনা। তখন আমার জড়িবুটির গুণে জলে রোগ সারত। কিন্তু এত লোক উৎপাত শুরু করল যে, তিষ্ঠোতে পারলুম না। এসে এই বাড়িতে জুটেছি। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, ওর মধ্যে আর লোক ডেকে এনে ভজঘট্ট পাকিয়ে তুলিসনি। তা হলে ফের আমাকে পালাতে হবে।”

একগাল হেসে পটলা বলে,“আচ্ছা তাই হবে। তুমি থাকো দাদু!”

কুঁজো আর ভূত
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে তার পিঠে ছিল ভয়ঙ্কর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালমানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান লোক ছিল। আর কোনো ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত, কানাই বড় দুষ্টু লোক। তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরনো বাড়ির কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারি বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে আসতে চায় না। বলে, ওটা ভূদের বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই। কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করি?

কতৎষণ সে এভাবে বসে ছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল, যেন সেই পুরনো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে অনেকগুলো গলা মেলে। আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে। শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য, কিন্তু কথা কালি এইটুকুঃ

‘লুন হ্যায়,তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!’

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল। সে ভাবল যে তারও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরলঃ

‘লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!’

এইটুকুই গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল

‘লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।’

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল। সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুশি হল যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ির ভিতরে বেয়ে গেল, আর যে আদরটা করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মেলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলঃ

‘লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হিং হ্যায়!’ ‘লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁটকি হ্যায়।’

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন তার মনে হল, ‘কি আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কি করে?’ বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল-এ কি? তার সে কুঁজ যে আর নেই! একজন ভূত বলল, ‘কি, দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই। ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে।’

সত্যি সত্যে সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, তখন তার পাশে পড়ে ছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কি অনন্দই হল। আর হালকা আর আরাম বোধ

হল এমনি যে, সে তখনই সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নূতন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে, মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, এ কথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল, সেই ভাবল যে, এমন আশ্চর্য কথা আর কখনো শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনাবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করি দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাগো, কেবলহাটি যাব কোন পথে? কানাই বললে, 'এই ত কেবলহাটি। তুমি কি চাও?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভুতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

কানাই বলল, 'আমি ত সেই কানাই ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে

শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা জুড়ে দিয়েছিলাম। তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নূতন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কানাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্ট আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এরে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে, ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে গাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছেঃ 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায় , ইম্‌লী হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচা গোল্লা হ্যায়।

তখন গানের তাল ভেঙে ত গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এ সব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিচুতে এসে বললম 'কে রে তুই অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি? দাঁড়া তোকে দিখাচ্ছি!' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপর বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হল। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

ইলিশখেকো ভূত

পিন্টু পোহান

কলকাতা বেড়েই চলেছে। গ্রাম যাচ্ছে মরে। ভূত নেই। হাওয়া নেই। বাতাস নেই। রামলালের ওঝাগিরিও তাই চলছে না। তাও যদি কিছু ঝোপঝাড় থাকত, লোকে রাতের বেলা সাদা থান পরা শাকচুন্নি দেখতে পেত। সবই গেছে প্রমোটারের হাতে। রামলাল তাই পৈলানের পাট চুকিয়ে চলেছে নৈনানের দিকে। দামোদর পার হয়ে শিবগঞ্জ। ওখান থেকে ভগবানপুর। মাসির বাড়ি। ওখানে ওঝাদের রমরমা বাজার।

কথায় আছে, নদী এক পাড় ভাঙে অন্য পাড় গড়ে। ব্যবসা পড়ে যেতে রামলালের মনটা খুব ভেঙে পড়েছিল। কী করবে, কোথায় যাবে, কিছুই মাথায় আসছিল না। এমন সময় মাসি এল ঘুরতে। খাতির করে মাসিকে বসতে বলল। ভারী শরীর নিয়ে ভাঙাচোরা মোড়াতে বসতেই মোড়াটা ভূমি নিল। মাসিও।

বহু চেষ্টা করে মেঝে থেকে মাসিকে তুলল বটে, কিন্তু মাসির কোমরে খিঁচ লাগা রোধ করতে পারল না। কোমরের ব্যথায়, কিংবা হয়তো ভাগ্নের দুর্দশায়, মাসির চোখে জল চলে এল। বলল, ঘরের এ কী হাল করেছিস বাপ? একটা চেয়ারও জোটে না। রামলাল এ কথা শুনে কেঁদে ফেলল। আর চেয়ার! অর্ধেক দিন না খেয়েই কাটাতে হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে অপদেবতা বিমুখ হয়েছে আমার ওপর। কাউকে দেখা দেয় না। কারও ওপর ভরও করে না।

— বুঝেছি। তোদের এখানে এসেই বুঝেছিলাম। এ জায়গা আর অপদেবতার পবিত্র বাসস্থান রইল না। এতগুলো মানুষ জুটলে বেচারাদের যে দমও বন্ধ হয়ে যায়। তা, তুই এখানে পড়ে রইলি কেন? আমার কাছে গেলেই পারতিস। তোর

মেসোর তো এখন ঢালাও কারবার। একা সব কেস সামলাতে পারে না। বয়সও হয়েছে। তুই এখানকার পাট চুকিয়ে চ'। তোর কপাল ফিরে যাবে।

রামলাল তো তখনই এক পায়ে খাড়া। দু'দিন মাসিকে নিজের কাছে রেখে তোয়াজ করে খাওয়াল। ভেতরে-ভেতরে খদ্দের দেখাও শুরু করে দিল। যাবার সময় মাসি বলেছিল, 'দেরি করিস না বাবা। যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আয়।' তাড়াতাড়ি আর করা গেল না। বাড়ি বিক্রি করতে আর ধারদেনা চুকোতে দু'সপ্তাহ কেটে গেল।

মাসির বাড়িতে রামলাল পৌঁছল দুপুর বারোটায়। মাসি-মেসো দু'জনেই রামলালকে দেখে খুশি হল। ওদের নিজেদের কোনও ছেলেপুলে নেই। রামলালকে নিজের ছেলে বলেই মনে করে। মেসো বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে বের হচ্ছিল। রামলাল মেসোর হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'তোমাকে যেতে হবে না। আমিই হাটে যাব।'

মেসোও প্রতিবাদ না করে ওর হাতে ব্যাগ দিয়ে দিল। এখানকার পথঘাট সবই রামলালের চেনা। হাট থেকে দেখেশুনে ভাল দুটো ইলিশ কিনল। আর ফেরার পথেই ঘটল ঘটনাটা।

হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ব্যাগটা টেনে ধরল। পিছন ফিরে দেখল রামলাল। কাউকেই দেখতে পেল না। আবার হাঁটতে শুরু করতেই আবার পড়ল টান। আবার ফিরে ও কাউকে দেখতে পেল না।

রামলাল ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করল। পাত্তা না দিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে ব্যাগ ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এ বার ভূত বাবাজি রামলালের পথ আগলে দাঁড়াল। অনুনয়ের সুরে বলল, একটা মাছ দেবে?

— কেন রে? তুই আমার কে? রেগেমেগে বলল রামলাল।

ভূত বাবাজিও কম যায় না। বাঁজখাই গলায় চিৎকার করল, আমি ভূত! তোমার ভগবান!

— সত্যি! বলে রামলাল ভূতটার হাত চেপে ধরল। লাই পেয়ে ভূত আব্দার করে বসল, দুটো মাছ কিনেছ। একটা আমাকে দিয়ে যাও।

রামলাল নরম সুরে বলল, মাত্র দুটো মাছ কিনেছি রে। অনেক দিন পর একটু রসিয়ে খাব বলে। তোরা একবার আমার কারবারটা জমিয়ে দে, ভাল করে মাছ খাওয়াব।

ভূতটা নাছোড়। ঘাড় চুলকে, মাথা চুলকে বলেই চলে, পরের কথা পরে। আমাকে এখনই একটা দিতে হবে। এখনই দিতে হবে।

— বললাম মাত্র দুটো মাছ। একটা দিলে দুপুরের খাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে।

— একটা দাও, রাতে তোমাকে অনেক মাছ দেব।

— কী করে?

— রাতের বেলা সামনের নদীতে জাল ফেললে বুঝতে পারবে।

মন না চাইলেও একটা মাছ ভূতটাকে দিয়ে বিদেয় করল রামলাল।

সে-দিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মেসোর খ্যাপলা জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রামলাল। বাড়ির সামনে শ্মশানের পরেই নদী। দোনামনা করে নদীতে জাল ফেলল। কিন্তু জাল টেনে তুলতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কোনও রকমে জাল ডাঙায় তুলে দেখে মাছ আর মাছ। চাঁদের আলোয় মাছগুলোর গা থেকে যেন হীরকের দ্যুতি ঠিকরাচ্ছে।

মাছগুলো ব্যাগে ভরে আবার জাল ফেলল। আবার উঠল মাছ। এ রকম ভাবে সারা রাত মাছ ধরে ব্যাগে না কুলোতে পেরে একটা শুকনো ডাঙায় ফেলে রাখল। সকালবেলা মেসো তাকে ডাকতে এসে এই কাণ্ড দেখে অবাক! বলল, এ মাছ হাটে গিয়ে বিক্রি করতে হবে এখনই, নইলে সব মাছ পচে যাবে।

মেসোর কথা শুনে রামলাল জাল গুটিয়ে মেসোর সঙ্গে গেল হাটে মাছ বিক্রি করতে। মাছ বিক্রি করে প্রচুর টাকা পেল। টাকাগুলো মেসোর হাত দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে আবার দুটো ইলিশ মাছ কিনল। ফেরার পথে ভূতটা আজ আবার পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে একটা ইলিশ মাছ দেবে?

কথাটা শুনে রামলালের হাসি পেয়ে গেল। কোনও রকমে হাসি চেপে বলল, তুমি এত মাছ ধরে দিলে, মাছ চাওয়ার দরকার কী তোমার? নিজেই তো মাছ ধরে খেতে পারো।

ভূতটা হেসে বলল, আমি তো ইলিশখেকো ভূত। ইলিশ ছাড়া কোনও মাছ মুখে তুলি না। আর এই নদীতে ইলিশ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, ভূত কখনও মাছ ধরে নাকি? মাছ ধরে মানুষে। ভয় দেখিয়ে মাছ আদায় করাই ভূতের ধর্ম। ভূত হয়ে শেষে মানুষের কাজ করব? ছিঃ, একটা প্রেস্টিজ নেই!

জোলা আর সাত ভুত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক জোলা ছিল সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, ‘মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে পিঠে করে দাও।’

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল, চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুশি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল,

‘একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!’

জোলার মা বলল, ‘খালি নাচবিই যদি, তবে খাবি কখন?’

জোলা বলল, ‘খাব কি এখানে? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।’ ব’লে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে গেল, বলতে লাগল,

‘একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!’

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

‘একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!’

এখন হয়েছে কি-সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা ‘সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব’ বলছে, আর তা শুনে তাদের ত বড্ড ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিগুটি হয়ে কাঁপছে, আর বলছে,‘ওরে সর্বনাশ হয়েছে! ঐ দেখ, কেত্থেকে এক

বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে! এখন কি করি বল্ ত! অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন।'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ-তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই ত সে এমনি চমকে গেল যে, সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কি করব?'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমন পায়েস জোল কখনো খায় নি, তার মাও খায় নি, তার বাপও খায় নি। কাজেই জোলা যার-পর-নাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল, আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি।'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কি করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেইখানে যাই। তারপর বিকেলে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে।'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল 'বটে? আচ্ছা দেখি ত কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া, কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর জিলিপি, অমৃতি, চমচম এইসব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ি ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ-সব দেখে তার বন্ধু ভাল যে, এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন জোলাকে কতই আদর করতে লাগল! পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কি কষ্টই হয়েছে! গা দিয়ে ঘাম বয়ে পড়েছে! একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যি জোলার তখন ঘুব পেয়েছিল। কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা বিছানা করে দাও।' তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদ্‌লে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখো মা, কি চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে, মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখো আমি এর ভিতর থেকে সে-সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ ত আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা ব'নে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন ত জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে, 'সেই ভূত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, এ কথা তার মনেই হল না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

তা শুনে আবার ভূতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাত জোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ?'

ভূতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিয়ে ও হাসে, আর ও মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে ত আর হাসি ধরে না। সে ছাগাল নিয়ে ভাবল যে, এ জিনিস বন্ধুকে না দেখালেই নায়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দই পাখা দিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু ত এর মধ্যে কখন তার ছাগল চুরি করে তার জায়গয় আর-একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল। এসে দেখল, যে তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না, মা। আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুমি হয়ে নাচবে!' বলেই সে ছাগলের বগলে আঙুল দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্ত তাতে হাসলো না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিলে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে অমনি বিষম গুঁতো মারল যে, সে চিত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমনি বকুনি দিল যে, তেমন বকুনি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার রাগ যে হল, সে আর কি বলব! সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব, সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

'বেটারা আমাকে দুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস-আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি মশাই, আমার কি করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কিরে আপনার নাক থেঁতলা করলুম?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কি দশা করেছ। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব!'

ভূতেরা বলল, 'সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম।সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই ত হছেয়ে! আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' একথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়ি চুরি করেছে। এখন কি হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, ‘এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে। ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, ‘লাঠি লাগ। ত!’ তা হলে দেখবেন, কি মজা হবে! লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।’

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুর গিয়ে বলল, ‘বন্ধু, একটা মজা দেখবে?’

বন্ধু ত ভেবেছে, না জানি কি মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, ‘লাঠি, লাগ্ ত!’ তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনো দেখে নি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটতে পিটতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, ‘তার পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাড়ি নে, তোর ছাগল নে আমাকে ছেড়ে দে।’

জোলা বলল, ‘আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন্, তবে তোকে ছাড়ব।’

কাজেই বন্ধুমশাই আর করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, ‘সন্দেশ আসুক ত“!’অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে তার লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি হাতি-ঘোড়া-খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যার পর নাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুটতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুটে কখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, ভাই, এখন কি করি বল্ ত? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা ললর, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলেই সে তার লাঠিটি বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুটতে লুটতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতি ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুটে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ্ ত।' আর যাবে কোথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতি- ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল্ আর পিটুনি যে কেমন দিল, সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুটেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, ‘রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে বলছে, আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কি হুকুম হয়?’

রাজামহাশয়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিযে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে মাপ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন,‘ আর এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তা হলে তোমার মাপ করব।’

সে ত তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল,আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল! সে ভোজ খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে, তবে হয়ত এখনো খাচেছ। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

ভুতো আর ঘোঁতো
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভুতো ছিল বেঁটে আর ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙা। ভুতো ছিল সেয়ানা, আর ঘোঁতো ছিল বোকা। দুজনে মিলে গেল কুলগাছ থেকে কুল পড়াতে। ঘোঁতো কিনা ঢ্যাং, সে দুহাতে খালি কুলই পাড়ছে। ভুতো কিনা বেঁটে, তাই সে কুল নাগাল পায় না, সে শুধু ঘোঁতোর পাড়া কুল খাচ্ছে।

কুল পাড়া হয়ে গেলে ঘোঁতো বলল, 'কুল কইরে?' ভুতো বলল, 'নেই। খেয়ে ফেলেছি।' ঘোঁতো বলল, 'বটে রে? তবে দাঁড়া লাঠি আনছি।'

বলেই অমনি ঘোঁতো গেল গাছ কাটতে। গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে। লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল-একটাও রাখল না?

গাছ বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ? কোথা যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে পেলল, একটাও রাখল না?' গাছ বলল, 'আমাকে কাটবে? কি দিয়ে কাটবে? কুড়ুল কই?

ঘোঁতো গেল কুড়ুল আনতে। কুড়ুল বলল, 'এই যে ঘোঁতো? কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'কুড়ুল আনতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল, একটাও রাখল না?' কুড়ুল বলল, 'আমাকে নেবে? শানাবে কিসে? পাথর কই?'

ঘোঁতো গেল পাথর আনতে। পাথর বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'পাথার আনতে; আথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে, লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে

কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' পাথর বলল, 'আমাকে নেবে? ভেজাবে কি দিয়ে? জল কই?'

ঘোঁতো গেল জল আনতে। জল বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ? কোথা যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'জল আনতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি ভুতোকে মারতে, সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' জল বলল, 'আমাকে নেবে? হরিণ আসবে, আমাতে নামবে, গা ভিজবে, তবে ত হবে।'

ঘোঁতো গেল হরিণের কাছে হরিণ বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' হরিণ বলল, 'আমাকে নেবে? কুকুর কই? আমাকে ধরবে কে?'

ঘোঁতো গেল তাদের কুকুর ভোলাকে ডাকতে। ভোলা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ?' ঘোঁতো বলল, 'ভোলাকে ডাকতে; ভোলাকে দিয়ে হরিণ ধরাতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' ভোলা বলল, 'আমাকে নেবে? তবে মাখন আনো, নখে মাখি।'

ঘোঁতো গেল মাখন আনতে। মাখন বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কেথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'মাখন আনতে, ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে

মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মাখন বলল, 'আমাকে নেবে? তবে বেড়াল আনো, চেটে তুলুক।'

ঘোঁতো গেল তাদের মেনির কাছে। মেনি বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ! কোথায় যাচ্ছ? ঘোঁতো বলল, 'মেনিকে খুঁজতে, মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে, হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাকে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিযে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না? মেনি বলল, আমকে নেবে? দুধ দাও তবে, খাই আগে।'

ঘোঁতো গেল গাইয়ের কাছে। গাই বলল, 'এই যে ঘোতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছে?' ঘোঁতো বলল, 'গাইয়ের কাছে দুধ আনতে; মেনির তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' 'দুধ নেবে? খড় আনো তবে, খাই আগে!'

ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ! ঘোঁতো বলল, চাষার কাছে খড় আনতে; গাইকে দুধ পেতে, মেনি খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' চাষা বলল, 'খড় নেবে? আটা আনো, পিঠে খাব।'

ঘোঁতে গেল মুদীর কাছে। মুদী বলল, 'এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'মুদীর কাছে আটা আনতে, চাষাকে দিয়ে খড় নিতে; খড়

নিয়ে গাইকে দিয়ে দুধ পেতে, মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে; নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে, জল দিয়ে পাথর ভেজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না?' মুদী বলল, 'নদী থেকে এই চালনি ভরে জল আনো, নইলে আটা পাবে না।'

চালনি নিয়ে খুশি হয়ে ঘোঁতো গেল নদী থেকে জল আনতে। জল ত তাতে থাকে না, তুলতে গেলেই পড়ে যায়। যত তোলে ততই পড়ে। বেলা হল, বেলা গেল, সন্ধ্যা এল। ঘোঁতো তবু খালি চালনি ডোবাচ্ছ আর তুলছে, আর খালি ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। ঘোঁতো বলল, কি মুশকিল! এখনকি হবে?

সেখানে কতকগুলো হাঁস ছিল, তাঁরা প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছিল। তা শুনে ঘোঁতো বলল, 'আরো তাই ত, ঠিকই ত বলেছে। চালনিতে পাঁক মাখিয়ে নিতে হবে, তাহলেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে আর জল ধরবে।' নদীর ধারে পাঁক ছিল, ঘোঁতো তাই নিয়ে চালনিতে মাখাল। ফুটো বন্ধ হয়ে গেল, আর জল পড়তে পেল না। ঘোঁতো তখন হাসতে হাসতে জল নিয়ে মুদীর কাছে ফিরে এল। মুদী তাতে খুশী হয়ে ঘোঁতোকে ঢের আটা দিল। আটা নিয়ে ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা তাতে খুশি হয়ে ঘোঁতোকে খড় দিল। খড় নিয়ে ঘোঁতো দিল গাইকে; গাই তা খেয়ে খুশি হয়ে ঢের দুধ দিল। দুধ নিয়ে ঘোঁতো দিল মেনিকে; মেনি তা খেয়ে খুশি হয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিল। ভোলা সে মাখন নখে মেখে হরিণ ধরে আনল। হরিণ গিয়ে জলে নেমে গা ভিজিয়ে এল। ঘোঁতো তার গা থেকে জল নিয়ে পাথরে দিল, সেই পাথরে কুড়ুল শান দিল, সেই কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটল, সেই গাছ দিয়ে লাঠি বানাল, সেই লাঠি নিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে ছুটে গেল কুলগাছতলায় ভুতোকে মারতে। ভুতো কি ততক্ষণ গাছতলায় বসে? সে তার কত আগেই ছুটে পালিয়েছে।

ভূতের গল্প
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমি ভূতের গল্প বড় ভালবাসি। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘন্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা! একটা শুনিলে আর-একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটা শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছে হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কি না জানি না, বোধ হয় আছে। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলি। গল্পটা একখানি ইংরেজি-কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরেজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি, প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

'স্কটল্যাণ্ডের ম্যাপটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইস্ট্, নীচেরটির নাম সাউথ্ উইস্ট্। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আর কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখত স্টীম্ এঞ্জিনও ছিল না, টেলিগ্রাফ্ও ছিল না। আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টারি করিতেন।'

'সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ; তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। ... এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐরকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত।'

‘এই দ্বীপে এল্যান্ ক্যামেরন নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাস্টারমহাশয়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরন বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার বিষয়-সমস্ত বিক্রি হইয়া গেল। তাঁর বাড়িটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।’

‘এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্ ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির! সেখানেই সে হাঁ করিয়ার দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।’

‘শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐরকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানাশুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে ত মার দৌড়! একেবারে মাস্টার-মশাইয়ের বাড়িতে। তাঁহার কাছে সব কথা সে বলিল। মাস্টারমহাশয় এ-সব মানেন না। তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা করিলেন, তারপরে বলিলেন, তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছি; আরো অনেক কথা বলিলেন-বলিয়া যাথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য।’

‘ডনাল্ড্ কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্প বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই গল্প জানিতে পারিল।

ঐ-সব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধরাই মজবুত। তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।'

'ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাস্টারমহাশয়ের কাছে খবরের কাগজ আসিত। মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া নূতন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ-বার জন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষে কথাগুলি সকলেরই একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল, এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায় সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।'

'এই-সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক। একটি কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিলে সহজে ছাড়িবে না।'

'ডনাল্ড ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাস্টারমহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। এ রাখাল যে স্থানে যেভাবে উহাকে দেখিয়াছির, এও ঠিক সেইরকম দেখিয়াছে।'

'এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া! মাস্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষাণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না। এবারেও মাস্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামেরনের ভূতের বিষয়

বিশেষভাবে বিচার চলিতে লাগিল। আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু রীরর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল-'

'দেখ মস্টারের পো, যতই কেন বল না, আমি এক জোড়া নতুন বুট হারব, তোমার সাধ্যি নেই আজ দুপুর রেতে ওখান থেকে গিয়ে দেখে এস।'

'সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ররী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাস্টারমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁহার যে নিদেন পক্ষে তিনি যে এ মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেন।'

'মাস্টারমহাশয় দেখিলে, অস্বীকার করিলে যশের হানি হয়। তিনি বলিলেন, "যাব বই কি? কিন্তু আমি ফিরে এলেও এর চাইতে আর তোমাদের জ্ঞান বাড়বে না।"

ররী-'আচ্ছা দেখা যাউক।'

মাস্টারমহাশয়-'ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি কর্‌ব?'

ররী-'ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে-এল্যান্ ক্যামেরন আছে গো!' কান জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানবো না।

মাস্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান, সেখানে থাকলে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।'

একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও, তা হলে মুচির কাছে যে ও টাকা পেতে, সে কথাটা তুল না।' এ কথায় সকলে হাসিয়া ফেলিল, ররী একটু অপ্রস্তুত হইল।

'এইরূপে হাসি-তামাশা চলিতে বলিল-'বারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তুমি এখন গেলে ভাল হয়; তাহলেই ঠিক ভূতের সময়টাতে পৌঁছতে পারবে।'

'বেশ করিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইযা মাস্টারমহাশয় যষ্টি হস্তে সেই বাড়ির দিকে চলিলেন। মাস্টারের যাইবার সময়ে সকলেই দু-একটি খোঁচা দিয়া দিল এবং স্থির করিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।'

'রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কাল কাল মেঘে আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাস্টার চলিয়া গেলে সকলে আরম্ভ করিল যে, সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরি বলিল যে তিনি হয়ত অর্ধেক পথ গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয়, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব করিল যে, ররী যাইয়া দেখিয়া আসুক।'

'প্রথমে ররী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতায় পরে রাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল যেন মাস্টার তাহাকে দেখিতে না পায়, তারপর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত এই গুণে শীঘ্রই সে মাস্টারকে দেখিতে পাইল। ররী একটু দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্যে দিয়া।একটি গাছপালা নাই যে মাস্টার ফিরিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিয়া বাঁচিবে।

'পরে মাস্টারমহাশয় যখন ঐ বাড়িতে পৌঁছিলেন, তখন ররী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে আসিল। সেখানে একটু নিচু বেড়া ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।'

'সে অবস্থায় দূতের কার্য করিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর গুর করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয় ছিলেন বলিয়া, নইলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয়। মনে করিয়াছে,

মাস্টারমহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।'

'গ্রামের গির্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র চাহিয়া দেখিল যে মাস্টারমহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।'

'মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন-'এল্যান্ ক্যামেরন আছে গো!'-কোন উত্তর নাই।

'দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন, 'এল্যান্ ক্যামেরন আছ গো!'-কোন উত্তর নাই।

'তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটি মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্থচিৎকার অর্থ আহ্বানের মত করিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, 'এল-ক্যামেরন-আছ-।' তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই।-সটান চম্পট।

'কি সর্বনাশ! কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন মুচি বেচারীর আর আতঙ্কের সীমা নাই।তবে বুঝি ভূত এল! আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারমহাময়ের পেছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকার শব্দ মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার শব্দও শুনিতে পাইলেন। আর কি? ঐ এল্যান্ ক্যামেরন! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়িতে লাগিলেন। ররী বেচারা দেখিল বড় বিপদ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে, তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমহাশয় দেখিলেন, পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহস ভর করিলেন

এর খুব শক্ত করিয়া লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের মস্তকে ‘সপাট’-সাংঘাতিক এক ঘা! তারপর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।’

‘ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলোক না দেখা গেল, ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল, তখন ঘরে গেলেন-যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিন সকলগুলিরই উত্তরে বলিলেন’-

‘ঐ আমি যা বলেছিলাম, ভূতটুত কিছুই ত দেখতে পেলাম না!’

‘এরপর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে, সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।’

‘আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল। তারপর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাস্টারমহাশয় শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।’

সকলেরই বিশ্বাস হইর, মাস্টারমহাময়ের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ চৈ কাণ্ড! সকলেই জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটি কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির আসিয়া তাহারা মাস্টারকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরে গোলমালে গাঁয়ের লোক জাগির। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারখানা কি?’

‘এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্য দিয়ে দৌড়িতেছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে- কেবল পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেট-জুরী-ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।’

‘সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত একপ্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া দেখা গেল, একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টারমারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত শুনিল।’

‘শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোকে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরনের মুখের মত। সেদিন চন্দ্র ছিল না, মাস্টারমহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।’

স্বর্ণমৃগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দুই শরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ-কখানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বৃদ্ধির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক,

অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়। ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উন্নতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজ গৃহের কিছুই তাঁহার ভালো লাগে না। সকলই অসুবিধা এবং মানহানি-জনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকে-শাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে। এ-সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব।

সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন স্বামীর শিল্পকার্যে বাঁধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন, 'গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও।'

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন, 'দুধটা-- বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।'

গৃহিণী উত্তর করিতেন, 'আমানি।'

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত-- গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, 'আমি জানি না। যা করিতে হয় তুমি করো।'

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কী করিতে হইবে।'

স্ত্রী বলিতেন, 'এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো।' বলিয়া এমন একটা ফর্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয়যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন, 'এত কি আবশ্যক আছে,' উত্তর শুনিতেন, 'তবে ছেলেগুলো না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।'

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা-কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যাবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, 'হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।'

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'বিধবাবিবাহ করিব' বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কী একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না, তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সেজন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল মূর্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহার্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন, সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে-বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড়সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণপ্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্যাস্তপথের মতো জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল, 'কাল সোনার রঙ ধরিবে।'

সেদিন রাত্রে আর কাহারো ঘুম হইল না; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাত্রে দাম্পত্য-একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চার দিক হইতে সোনার রঙ ঘুচিয়া গিয়া সূর্যকিরণ পর্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুরস্বরে বলেন, 'বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাকো।' বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে একমূহূর্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'কি আনিয়াছি বলো দেখি।'

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, 'কেমন করিয়া বলিব, আমি তো আর 'জান' নহি।'

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট স্টুডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল-- অপর্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, 'আ মরে যাই। এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ করোগে। এ আমার কাজ নাই।' বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন জোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভালো, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল, বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যাবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জনের সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনোদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্ খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবুরি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন, 'একটু নড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে।'

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না। অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু, কুমড়া, শুষ্ক নারিকেল, টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে-- এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, 'বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।'

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্বক গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে অবু, এবার পুজোর সময় কী চাস বল্ দেখি।'

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'একটা নৌকো দিয়ো বাবা।'

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল, 'আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।'

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর-কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, 'আচ্ছা।'

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, 'ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে।'

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদগতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, 'কী সর্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না।'

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে 'অশিক্ষিত পটুত্ব' আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই-তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলো কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকাদুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড়ি আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলনাদুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ।

ছোটো ছেলে তো ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। 'বোকা ছেলে' বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, 'বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়া কুড়িয়ে নিয়ে আসব।'

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়। তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল, তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেইসঙ্গে দুর্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে-- ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা

সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়। তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে-- বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখান্বিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্তী ছোটো কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মতো আছে-- কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন-- অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া

দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনতিউচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে-- অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল একহাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে একমুহূর্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্‌লিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসি বাঁধা রহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিকলি কলসির উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসির কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসি শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না-- দুই হস্তে কলসি তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসির গলা ভাঙা। যেন এককালে এই কলসির মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কী একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা-- সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন-- ভিতরে কিছুই নাই। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার পূর্ববর্তী যে-ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া 'মা' বলিয়া মস্ত একটা মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন -- প্রতিধ্বনি যেন অতীতকালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মতো ঝুপ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিসপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে

ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন-- তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল-- ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লান হাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তারপর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ।'

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইল।'

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল, 'সেই নাপিতের গল্প বল্।' বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া, বৈদ্যনাথের বড়োছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, 'বাবা।'

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, 'বাবা।' কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

লক্ষ্মী আচার্যির গল্প
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

হরিহরডাঙার চর।

একদিকে নাড়ুগ্রাম, অন্যদিকে ভ্যালাইগাছি মধ্যে বাবুর মায়ের মরা খাল। এই মরা খালের ওপারে মরা ঘাট। অর্থাৎ হরিহরডাঙার চর। তবে হরিহরডাঙা কেউ বলে না। বলে হরারডাঙা।

সেই হরারডাঙার চরে লক্ষ্মী আচার্যি রোজ রাত্রিবেলা ভূতের কাঁধে চেপে জপ করতে যেতেন। আর ফিরে আসতেন প্রায় মাঝরাতে ভূতের কাঁধে চেপে। তিনি ছিলেন মস্ত গুনিন। তাঁর মতো গুনিন এ তল্লাটে কেন, গোটা বর্ধমান জেলাটার মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। মন্ত্রের শক্তিতে ভূতকে তিনি বেঁধে রেখেছিলেন। পান থেকে চুন খসবার আগেই ভূতেরা তাঁর সব হুকুম তামিল করে দিত। তাঁকে পালকিতে বসিয়ে সেই পালকি কাঁধে করে বইত। অনেকেই নাকি আড়ালে আবডালে লুকিয়ে দেখেছে এ দৃশ্য। ছায়া ছায়া কালো কালো কী বিচ্ছিরি সব চেহারা! কেউ দেখেছে আস্ত কঙ্কাল। কেউ বা কিছুই দেখেনি। শুধু মাঠের ওপর দিয়ে দুলকি তালে দুলে দুলে যেতে দেখেছে পালকিটাকে। সেই পালকির ভেতরে বসে আছেন গুনিনের সেরা গুনিন—লক্ষ্মী আচার্যি।

সবাই বলে, লক্ষ্মী আচার্যি নাকি পিশাচসিদ্ধ লোক।

চেহারাটিও তেমনই—এ-ই লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা। খুব কম করেও সাড়ে ছ’ ফুটের বেশি হবেন তবু কম নয়।

ঘন কালো গায়ের রং।

পরনে লাল চেলি। রক্তবস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চাঁড়ালের হাড়, শকুনির হাড়, ধনেশ পাখির হাড়ের মালা। নানারকমের লাল নীল পুঁতি, গাছের শিকড় আর কড়ির মালা। কতরকমের দুষ্প্রাপ্য তবলকি। কপালে ডগডগ করত তেল সিঁদুর। লম্বা করে টানা। মাথায় মস্ত টাক। চোখদুটি লাল। রক্তবর্ণ। যেন ভাটার মতো জ্বলছে। চোখ উঠলে যেমন লাল দেখায় তার চেয়েও লাল। সব তেজের যেন ওই চোখের মধ্যেই প্রকাশ। সেই লাল চোখদুটি নেশায় ঢুলু ঢুলু করত সর্বক্ষণ। ঠিক যেন মহাকালের অবতার। লোকেরা তাই ভয়ে ভক্তি করত সকলে। বলত, "বাবা রে! সাক্ষাৎ কালভৈরব গো।"

আচার্যিকে দেখলে ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত সকলের। শুধু ভয়ের জন্য নয়, গুণের জন্যও ভক্তি করত সবাই।

জিন আর করিমের মতো অপদেবতাও হার মানত আচার্যির কাছে। যাদের হার মানাতে আচ্ছা আচ্ছা গুনিনও হিমশিম খেয়ে যেত। লোকে তাই দুপুর রাতে মাঠে-ঘাটে একলা গেলে নাম নিত আচার্যির। তাদের মনে এ বিশ্বাস স্থিরভাবে জন্মেছিল যে, আচার্যির নাম নিলে ভূত তো ভূত, ভূতের বাবাও আর কাছে ঘেঁষবে না।

সেবার নাড়ুগ্রামে কলেরা মাহামারীরূপে দেখা দিল। গ্রাম উজাড় করে মরতে লাগল সব। যে বাড়িতে রোগ ঢোকে সে বাড়িতে বাতি দিতে কেউ অবশিষ্ট থাকে না। কে কার মুখে জল দেয় এমন অবস্থা!

সবাই গিয়ে তখন লক্ষ্মী আচার্যিকে ধরল। আচার্যি তখন সবে তাঁর গৃহদেবতা মহাকালীর পুজো সেরে উঠেছেন। উঠেই দেখেন সারি সারি সব দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, "কী ব্যাপার রে? আমার এখানে কেন?"

লোকো দুলে বলল, "এখন আপনিই আমাদের ভরসা আচার্যি! আপনি দয়া না করলে যে সবাই মারা পড়ি।"

আচার্যি বললেন, “হু।” বলেই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, “দেখি মাকে বলে কী করতে পারি। পাপ করবি তোরা, আর মায়ের কাছে হত্যে দেব আমি ?”

পঞ্চা বাগদি বলল, “আপনিই আমাদের মা-বাপ। আমাদের হয়ে মাকে আপনিই একটু বলুন। আমাদের ডাক তো মা শুনবে না। আপনার কথা যদি শোনে।”

আচার্যি বললেন, “অমাবস্যা কবে ?” “আজ্ঞে, তা আমরা কি জানি ? মুখ্যসুখু মানুষ।” আচার্যি তখন হিসেব করে বললেন, “কুজবারে অমাবস্যা আগামীকাল। তোরা শ্মশানে মায়ের পুজোর ব্যবস্থা কর।”

সকলে মহা ধুমধামে হরারডাঙার চটানে শ্মশান-কালীর কাছে পুজোর আয়োজন করল। আচার্য এলেন পুজো করতে। তবে ভূতের কাঁধে চেপে নয়, হেঁটে হেঁটে। সারারাত ধরে চলল পুজো, হোম ইত্যাদি। শেষরাতে পুজো শেষ হলে মা মা' বলে চিৎকার করতে লাগলেন আচার্যি। একটা হাত শূন্যে তুলে বললেন, “দে দে, তাড়াতাড়ি দে।” কার উদ্দেশে কাকে যে বললেন তা কে জানে!

সবাই অবাক হয়ে দেখল, সেই অন্ধকার শ্মশানে মস্ত একটা অর্জুন গাছের ডাল দুলে উঠল। তারপর কালো ছায়ার মতো আধপোড়া একটা হাত আচার্যির হাতে একটা মড়ার মাথার খুলি বসিয়ে দিল।

আচার্যি সেটা নিয়ে মুখের কাছে এনে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর সেটা কারণ-মিশ্রিত করে তুলে দিলেন গাঁয়ের লোকেদের হাতে। বললেন, “এই হল মহৌষধ। প্রত্যেকে একবিন্দু করে জিভে দাও। আর যার যার বাড়িতে রোগী আছে তারা সেই রোগীর মুখেও একবিন্দু করে এই ওষুধ দিয়ে দাও।” তারপর বললেন, “তোমরা এখুনি কেউ যাবে না। আমি না যাওয়া পর্যন্ত। এখনও আমার কাজ বাকি আছে।” এই বলে একটা বড়

ঝাঁটা হাতে নিয়ে সেই অর্জুন গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওরে কে আছিস ?”

গাছের ডাল অমনি দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছরছর করে একটা ডাল পাতা জোরে নাড়িয়ে দেওয়ার শব্দ।

আচার্য বললেন, “এই ঝাটা নে মায়ের আদেশ। গ্রাম থেকে বেঁটিয়ে সব রোগ এখুন তাড়িয়ে দে। বুঝলি?”

আবার সেই ভয়ঙ্কর আধপোড়া লম্বা হাত চোখের পলকে আচার্যির হাত থেকে ঝাঁটাটা তুলে নিল।

আচার্য বললেন, "এবার আমি যাব।” বলে একটা শাঁখ হাতে নিয়ে জোরে ফু দিতে দিতে খালের পাড় ধরে বরাবর চলে গেলেন আচার্যি।

আশ্চর্যের কথা! এরপর কলেরা একদম নির্মুল হয়ে গেল গ্রাম থেকে। আর কেউ মরল না। যারা ভুগছিল তারাও সেরে উঠল। আচার্যির কৃপায় প্রাণে বাঁচল সবাই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নাড়ুগ্রামে আর কখনও কারও কলিরা হয়নি।

লক্ষ্মী আচার্যর ভাই গোবর্ধন আচার্য একবার বিয়েবাড়ির নেমতন্ন খেয়ে দূর গ্রাম থেকে আসছে। তখন মধ্যরাত্রি। ঘুটযুট করছে অন্ধকার। হালদার পুকুরের পাড়ে এসে বাধা পেল গোবর্ধন। দেখল তার ঠিক যাওয়ার পথটির ওপর বসে আছেন প্রভু। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল গোবর্ধনের। অথচ যাওয়ার এই একটিই মাত্র পথ।

গোবর্ধন তখন অনুনয় বিনয় করতে লাগল, “পথ ছাড়ুন গো মশায়। যেতে দিন।”

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

উত্তর এল, “তোর হাতে কী?”

“বিয়েবাড়ি খেতে গিয়েছিলুম। লুচি মিষ্টি মাছ এসব আছে।”

“ওগুলো রেখে যা।”

“সে তো এখন শ্মশানে বসে জপ করছে। সে খাবে না। তুই রেখে যা।”

“কিন্তু দাদার নিষেধ। দাদা যে বলেছে রাতভিতে পথে কেউ কিছু চাইলে দিবি না।”

“বলুক। আমার খিদে পেয়েছে। তুই আমায় দে।”

“দেব। তবে তার আগে তুমি আমাকে শ্মশানে দাদার কাছে পৌঁছে দাও। তাকে জিজ্ঞেস করে তারপর দেব।”

ব্যস, কেউ আর নেই। পথ ফাঁকা।

গোবর্ধন মনের আনন্দে পুকুরপাড় থেকে আলে নামল। তারপর আল পেরিয়ে কুলিতে উঠতে যাবে এমন সময় দেখল মস্ত একটা বাঁশঝাড় সটান শুয়ে আছে রাস্তার ওপর।

মহা বিপত্তি! কোনওরকমেই যাওয়ার উপায় নেই।

গোবর্ধন বলল, “আবার আমার পিছু নিয়েছিস?”

“তুই খাবার দিলি না যে?”

“বললুম তো আমাকে দাদার কাছে নিয়ে চল।”

“তোর দাদার সঙ্গে আমার বিবাদ। তার কাছে যাব না।”

“তবে পথ ছাড়।”

“যা না তুই।”

“কী করে যাব? রাস্তার ওপর এভাবে বাঁশঝাড় শুইয়ে রাখলে কখনও মানুষ যেতে পারে?”

“ও তো ঝড়ে পড়ে গেছে।”

“কোথায় ঝড় ? আজ সারাদিন ধরে অসহ্য গুমোট চলছে। পাতা নড়েনি গাছপালার। আর তুই বলছিস ঝড়ে পড়েছে। ওঠা শিগগির।”

“ওর তলা দিয়ে গলে যা না তুই।”

“তা হলে আমাকে টিপে মারবার খুব সুবিধে হয়, না ?”

“না রে। কিছু করব না। তোর ভয় করে তুই ডিঙিয়ে যা।”

“তাও যাব না। পথ পরিষ্কার না করলে যাবই না আমি। সকাল হোক। তারপর দাদাকে গিয়ে বলি সব।”

গোবর্ধন আর অনুরোধ না করে বসে পড়ল সেখানে। বসে বসে মা মহাকালী আর লক্ষ্মী আচার্যিকে স্মরণ করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ গোবর্ধন দেখতে পেল হরারডাঙার দিক থেকে দুটো কঙ্কাল লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকে আসছে। দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল গোবর্ধনের। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল গোবর্ধন। মনে হল, এখুনি হার্টফেল করবে বুঝি।

কঙ্কাল দুটাে এসে বলল, “ভয় নেই। আমাদের আচার্যি পাঠিয়েছে।” বলে সেই গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, “বড় সাহস তোর না? আচার্যি আজ বারোটা বাজাবে তোর। শিগগির গাছ তোল। তারপর আমরাও মজা দেখাচ্ছি তোকে।”

সশব্দে সেই লম্বা লম্বা বাঁশঝাড়গুলো খাড়া হয়ে গেল তখন।

গোবর্ধন আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিল ঘরের দিকে। পেছনে তখন বাঁশঝাড়ের ভেতর তিন ভূতের প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। আর তার সঙ্গে আঁউ আঁউ আর খ্যা খ্যা শব্দ কানে এল।

আলাদপুরের একটা লোককে ভূতে ধরল একবার।

ভূতটা ভারী বেয়াড়া। সব ওঝা হার মানল তার কাছে। সেখানকার লোকেরা তখন ঠিক করল লক্ষ্মী আচার্যিকে ডাকতে যাবে। গ্রামের বেশ মাতব্বর গোছের দু'জন লোক এসে হাজির হল লক্ষ্মী আচার্যির কাছে।

আচার্যি তাদের চিনতেন। একজনের নাম ভজহরি বিশ্বাস, আর একজনের নাম কেষ্ট দাশ।

আচার্যি বললেন, "কী ব্যাপার ভজহরি! এমন অসময়ে ?"

"মুশকিল হয়েছে আচার্যি মশাই।"

"কেন ? কেন?"

"আমাদের গ্রামে একজনকে ভূতে ধরেছে। বড় বেয়াড়া ভূত। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। সব রোজা হার মেনেছে তার কাছে। এখন একমাত্র ভরসা আপনি। আপনি গিয়ে না ছাড়ালে মারা পড়ে যাবে বেচারি।"

"তা না হয় ছাড়াব। কিন্তু যত ভূতে কি তোদেরকেই ধরে? কই, আমাকে তো ধরে না ?"

"কী যে বলেন আচার্যি! আপনি হলেন গুনিনের সেরা গুনিন। ভূতেরা আপনাকে কাঁধে নিয়ে ঘোরে। আপনার আজ্ঞাবহ। আমাদের ভাগ্য যে আপনার মতো লোককে আমরা বিপদে পাই।"

আচার্যি হেসে বললেন, "চল চল। দেখি কীরকম ভূত ধরেছে তোদের লোককে খুব তালে এসে পড়েছিস। নাহলে আর একটু পরেই আমি বেরিয়ে যেতাম।"

আচার্য চললেন আলাদপুরে।

আলাদপুরে পৌছনো মাত্রই গাঁয়ের উৎসাহী লোকেরা চলল আচার্যির পিছু পিছু। গুননের সেরা গুনিন এসেছে। তাঁর ভূত ছাড়ানো দেখতে হবে বইকী!

খবর পেয়ে আশপাশের গ্রাম থেকেও বহু লোক ছুটল।

আচার্যর ডাক পড়েছে যখন, ব্যাপারটা তখন নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।

আচার্য রোগী দেখলেন। রোগীর চোখমুখের ভাব দেখে বললেন, "হু।" এই হু বলাটা আচার্যর বৈশিষ্ট্য। কোনও জটিলতা দেখলেই হু। তা হলেই লোকেরা

বুঝে নেবে অবস্থা গুরুতর। হু বলে আচার্যি বললেন, “দাও দুটি সরষে চোঁয়া আর গুটিকতক প্যাঁকাটি দাও।”

রোগীর বাড়ির লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সরষে চুইয়ে প্যাঁকাটি ভেঙে আচার্যিকে এগিয়ে দিল। আচার্যি ভৈরবের মতো দাঁড়িয়ে মন্ত্র বলে সেই সরষে চোঁয়া ছুড়ে দিলেন রোগীর গায়ে। আর যায় কোথা! রোগী তখন বাবা রে মা রে’।

তারপর পাকাটির মাথায় আগুন ধরিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে পেছনের ফুটোয় ফু দিয়ে মুখে ধোঁয়া দিলেন আচার্য।

রোগী তো কাটা ছাগলের মতো ধড়ফড় করতে লাগল তখন, “ওরে তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমায় অমন করিস না রে! আমি এক্ষুনি ওকে ছেড়ে যাচ্ছি।”

আচার্যি বললেন, “তা তো যাবি রে ব্যাটা। কিন্তু ধরেছিলি কেন ?”

আর কথা নেই। ভূতে পাওয়া রোগী একদম চুপ। কেবল গোঁ গোঁ করে।

আচার্যি বলেন, “কই রে! কী হল ? বল, ওকে ধরেছিলি কেন ?”

“ও কেন আমার গায়ে মাছধোয়ার জল ছুড়ে দিয়েছিল?”

“তুই ছিলিস কোথায়?”

“আমি ওদের ছাঁচতলাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।”

“কেন তুই ওদের ছাঁচতলাতে ছিলিস ও কি ইচ্ছে করে তোকে দেখে তোর গায়ে ফেলেছে ?”

“না। আমাকে সরে যেতে না বলে ফেলেছে কেন?”

“বেশ করেছে ফেলেছে। তা তুই যখন দেখলি ও জল ফেলতে আসছে তখন তুই-ই বা সরে গেলি না কেন ?”

“বা রে! আমি কি ওকে দেখেছি?”

“ওদের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে তুই ওকে দেখতে পেলি না, আর ও তোকে না দেখতে পেয়ে তোর গায়ে জল ফেলেছে বলে তুই ওকে ধরলি?”

রোগী তখন প্যাচে পড়ে চুপ করে যায়।

আচার্যি বললেন, “তার মানে, ইচ্ছে করে ওকে ধরবি বলেই ওর জল তুই গা পেতে নিয়েছিস ?”

“না, তা কেন ?”

আচার্যি গম্ভীর গলায় বললেন, ‘কোথায় থাকিস তুই?”

“মজুমদারার ঈশান কোণে।”

“এই গ্রামের কাছাকাছি আমি থাকি, তুই জানতিস না?”

“জানতুম।”

“তা হলে কেন ধরেছিস বল ?”

“তোর গ্রামের লোককে তো ধরিনি আচার্যি।”

“ওরে ব্যাটা। যাক, তুই একে ছাড়বি কিনা বল ?”

“ছেড়ে দেব। সত্যি ছেড়ে দেব।”

“ছেড়ে দেব নয়। এক্ষুনি ছাড়।”

“তুই আগে চলে যা, তারপর ছাড়ছি।”

“না, তোকে এক্ষুনি ছাড়তে হবে।”

“এক্ষুনি?”

“হ্যাঁ।”

অবাক কাণ্ড যে লোক একটু আগেও ধূলোয় শুয়ে ছটফট করছিল, সে আবার সুস্থ হয়ে আচার্যিকে প্রণাম করে উঠে বসল।

সকলে জয়ধ্বনি করল আচার্যির। বলল, “হুঁ হুঁ বাবা। এ কি যা-তা লোক !”

"মনে করে ভূতে আচার্যির পালকি বয়। কত ভূত জব্দ হল—তো এ ব্যাটা কোন ছার।”

“ওঃ। এ যে ভেলকি দেখলুম রে ভাই।” বলে যে যার চলে গেল।

আচার্যও নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সন্ধের পর ভূতের কাঁধে চেপে ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে আলাদপুরের লোকেরা আবার এসে হাজির। সেই ভজহরি বিশ্বাস, কেষ্ট দাশ আবার এল। এসে হাতজোড় করে বলল, "পেন্নাম হই আচারর্যি মশাই।"

আচার্য তখন দাওয়ায় বসে গঞ্জিকা সেবন করছিলেন। বললেন, "কী ব্যাপার হে? আবার কী মনে করে ?"

"ব্যাপার সাংঘাতিক আচার্যি মশাই। আপনি চলে আসার পরই ভূতটা আবার এসে ধরেছে রোগীকে।"

উঠে দাঁড়ালেন আচার্য, "আবার এসেছে? এতবড় স্পর্ধা।"

রাগে উত্তেজনায় আচার্যি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। রাগলে তাঁকে ভয়ঙ্কর দেখায়। আস্ত মানুষটাই যেন পালটে যায় অদ্ভুতভাবে মুখখানি কঠিন হয়ে ওঠে। গালে ভাঁজ পড়ে। কপাল কুঁচকে যায়। দারুণ দেখায়। আচার্য বললেন, "ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।"

কিন্তু গেলে কী হবে? তাঁকে আসতে দেখেই ভূতটা ছেড়ে পালাল। রোগী তখন আবার সুস্থ দেহে প্রণাম করল তাঁকে বলল, "কী হবে আচার্যিমশাই?"

"কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। আমি তো আছি।"

আচার্যি মশাই চলে গেলেই ভূতটা ভর করে লোকটিকে। আর তাঁকে আসতে দেখলেই ছেড়ে পালিয়ে যায়।

মহা মুশকিল! - আচার্যি ভূতের ঠ্যাটামো দেখে চটে যান। যাবেন নাই বা কেন? এসব ঝামেলা আর ভাল লাগে না তাঁর। খুব কম করেও আশির ওপর বয়স তো হল। মন্ত্রশক্তিতে ভূতকে তিনি বশ করেছেন। কিন্তু জর মৃত্যুকে জয় করবেন কী করে? এ বয়সে কি আর ভূতের সঙ্গে ছ্যাঁচড়ামো করতে ভাল লাগে কারও ? শেষে একদিন রেগে বললেন, "ঠিক আছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত

করবই এর।” তারপর রোগীর বাড়ির লোকদের বললেন, “দেখ, আজ আর আমি যাব না। তবে কাল তোরা কেউ যেন ডাকতে আসিস না আমাকে। আমি রোজ যে সময়ে যাই কাল তার চেয়ে আগেই আমি যাব। আর আমি গেলে কেউ যেন ব্যস্ত হোস না। কারণ আমি যে গেছি এ-কথাটা রোগী যেন কোনওরকমে জানতে না পারে। কাল একটা শেষ বোঝাপড়া করতে চাই আমি।”

ভজহরি ও কেষ্ট দাশ ফিরে এল।

পরদিন লক্ষ্মী আচার্য ঠিক দুপুরবেলায় চললেন ভূত ছাড়াতে। আলাদপুরে পৌঁছেই আচার্য করলেন কি, সর্বাগ্রে একমুঠো ধুলো পড়ে সেই বাড়িটারন চারপাশে গণ্ডি দিয়ে দিলেন। তারপর সোজা গিয়ে ঢুকলেন রোগীর ঘরে।

রোগী তো আচার্যিকে দেখেই আঁতকে উঠল। তার পেটের পিলে মাথায় উঠে গেছে তখন। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ধরা পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে উঠল সে। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

রোগী আবার সুস্থ হয়ে প্রণাম করল আচার্যিকে। অতি কষ্টে চি চি করে বলল, “মরে গেলুম আচার্যিমশাই। আর তো পারি না। এইমাত্র আপনাকে দেখে আমাকে ছেড়েছে। আপনি চলে গেলেই আবার ধরবে আমায়।”

আচার্যি বললেন, “চুপ করে বসে থাকো তুমি। ওর যাওয়ার রাস্তা আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। আবার এক্ষুনি এসে ধরবে ও তোমাকে।”

আচার্যির কথা শেষ হতে না হতেই চেঁচিয়ে উঠল রোগী। চোখ লাল করে বলল, “ধরবে না তো কী করবে শুনি ? এত লোকের ওলাউঠো হয়, তোর হয় না? তোর কী এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি যে, আমাকে তাড়াবার জন্য এমন উঠেপড়ে লেগেছিস ?”

আচার্যি বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, “ওকে তুই ছেড়ে দিয়ে আবার কেন ধরেছিস বল ?”

“কেন ধরব না! আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম। কেন তুই গণ্ডি দিলি?” “আজ তোর শ্রাদ্ধ করব বলে গণ্ডি দিয়েছি।”

রোগী নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হয়তো বা গালাগালি করল আচার্যিকে।

আচার্য রোগীকে বললেন, “তুই যে সেদিন বললি আমি ওকে ছেড়ে যাব, তা আবার কেন ধরলি?”

আর কোনও উত্তর নেই রোগীর মুখে। আচার্যি এবার তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি বের করলেন। খুলিটা দেখেই লাফিয়ে উঠল রোগী, “ওরে বাবা। ওটা তুই বের করলি কেন আচার্য? শিবু চাঁড়ালের জামাই বিশুর করোটি ওটা, ও যে আমি চিনি। বিশুকে সাপে কাটল সেবার রথের দিনে। তা সে মড়া কেউ পোড়াতে দিল না। গাঁয়ের লোকেরা বলল কলার মাঞ্জাসে করে ওটা খালের জলে ভাসিয়ে দাও। সেই মড়া বাবুর মায়ের খালে ভেসে ঠেকল গিয়ে হরারডাঙার চটানে। শেয়াল কুকুরে ছেড়াছিড়ি করল। মাথাটা নিয়ে তুই প্রেতপুজো করে পচালি। তারপর তোর চ্যালারা ওটা পরিষ্কার করে তোকে কারণ খেতে দিল। ওটা তোর ঝুলিতে রেখে দে আচার্যি। তোর পায়ে পড়ি।”

আচার্য তখন ঝুলির ভেতর থেকে একটা বোতল বের করলেন। বললেন, “দেখছিস তো?”

“ওতে কী রে আচার্ষি ?”

“স্বাতী নক্ষত্রের জল।” আচার্য মড়ার মাথার খুলিতে স্বাতী নক্ষত্রের জল ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়লেন। তারপর সেই জল ছুড়ে মারলেন রোগীর গায়ে।

রোগী তখন বাপ রে মা রে” করে উঠল। "ওরে আমার ঘাট হয়েছে রে তোর পায়ে পড়ি আচার্সি। আমায় ছেড়ে দে। আর ধরব না একে।”

"তোকে আজ ঝাঁটাপেটা করে তাড়াব আমি।"

রোগী এবার তেতে উঠল, "দ্যাখ আচার্যি, মুখ সামলে কথা বলবি। আমাকে তুই যা-তা মনে করিসনি। এককালে আমি মস্ত পণ্ডিত ছিলুম। আজ কর্মদোষে প্রেতযোনি পেয়েছি তাই। যা বললি তা আর কোনওদিন বলবি না।"

"বেশ করব, বলব। যে সত্যিকারের পণ্ডিত হয় সে কখনও এইরকম ছ্যাঁচড়ামো করে?"

"খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলবি।"

"বেশ, বলব। তুই সত্যিই পণ্ডিত কি আকাট মুখ্যু তার পরিচয় দে আগে। তারপর বলব।"

"ঠিক আছে। আমাকে তুই পরীক্ষা কর।"

আচার্য একটু সময় কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "বল দেখি হরধনু কে ভেঙেছিল ?"

"তোর মরা বাবা ভেঙেছিল। ওই নাম আমাকে বলতে আছে যে বলব ?"

"তুই ব্যাটা জানিস যে বলবি?"

"জানি না তো জানি না। আমায় এবারের মতো ছেড়ে দে। আমার ঘাট হয়েছে।"

"এখন কি ছাড়ব? আগে তুই স্বীকার কর যে, তুই মুখ্যু। তবে তো ছাড়ব।"

"তা কেন করব ?"

"তবে কেন ছাড়ব ?"

"ওই প্রশ্নটা বাদ দিয়ে অন্য প্রশ্ন কর তুই।"

আচার্যি বললেন, "বেশ, তাই করছি। বল, দশরথের বড়ছেলের নাম কী ?"

"বলব না। ও নাম আমাকে বলতে নেই।"

"না বললে আমিও ছাড়ব না। আরও গালাগালি দেব।"

"একান্তই বলাবি তা হলে ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে শোন, সীতার পতির যে নাম, দশরথের বড়ছেলের সেই নাম।"

"এরকম উত্তর তো আমি চাই না।"

"আর আমাকে জ্বালাস না আচার্যি। ওই নাম বললেই আমি উদ্ধার হয়ে যাব। আমি তিন সত্যি করছি, আর কখনও এর ত্রিসীমানায় আসব না। এবার আমায় ছেড়ে দে।"

"যা। দূর হয়ে যা। তবে তুই যে যাচ্ছিস তার একটা চিহ্ন দিয়ে যা।"

"কী চিহ্ন চাস তুই বল?"

"এই শিলটাকে মুখে করে নিয়ে যা।"

"ওরে বাবা! ও আমি পারব না। আমার শরীর বড় দুর্বল। আমায় অন্য কিছু করতে বল আচার্যি।"

"তবে ওই জুতোজোড়াটা নিয়ে যা।"

"জুতো আমি ছুই না।"

"বেশ। ওই পাকুড়গাছের একটা কাঁচা ডাল ভেঙে দিয়ে যা তবে।"

"তা যাচ্ছি। গণ্ডি মুছে দে।"

আচার্যি গণ্ডি কেটে দিলেন।

তারপর সকলকে বললেন, "পাকুড়গাছের ডালটা ভাঙামাত্রই তারা যেন রোগীকে ধরে ফেলে। কেননা ভূতে ধরা লোকের গা থেকে ভূত যদি ছেড়ে যায় তবে সে-সময় পড়ে গেলে হয় অঙ্গহানি,নাহলে মৃত্যু হতে পারে। রোজার বাবারও তখন আর করবার কিছু থাকে না।"

যা হোক, রোগী তখন মাতালের মতো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। । তারপর সেইভাবেই টলতে টলতে কুলি (রাস্তা) ধরে পাকুড়গাছটার দিকে চলল। রোগীর

সঙ্গে চলল কয়েকজন সদাসতর্ক লোক। পাকুড়তলায় যাওয়ামাত্রই বিরাট একটা কাঁচা ডাল সকলের জোড়া জোড়া চোখকে বিস্মিত করে মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল গাছতলায়। আর সেইসঙ্গে হু হু করে হাওয়া বইতে লাগল। সে কী ভীষণ দমকা হাওয়া। যেন ঝড় উঠল। ধুলো কুটাে শূন্যে উঠে ঘুরপাক খেতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে রোগীর বাড়ির লোকেরা ধরে ফেলল রোগীকে তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ধরে নিয়ে এল তাকে। .

আচার্যি একটা রক্ষাকবচ করে ঝুলিয়ে দিলেন তার গলায়। আচার্যির কৃপায় সে-যাত্রা বেঁচে গেল লোকটি।

লক্ষ্মী আচার্যির ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। হ্যাঁ, গুনিনের মতো গুনিন বটে ! সবার সেরা গুনিন।

শুধু এই ঘটনা নয়—

আরও বহু ঘটনায় সাফল্য লাভ করেছেন লক্ষ্মী আচার্যি।

তবে কেউ প্রশংসা করলে তিনি খেপে যেতেন। বলতেন, "বেরো শালারা। যা করেছে তা আমার মা ব্রহ্মময়ী করেছে। আমি কী করেছি রে! আমায় তোষামোদ করতে এসেছিস কেন ? মায়ের চেয়ে আমি বড়, না ?"

কাজেই আচার্যির কাছে কেউ বড় একটা বিপদে না পড়লে সচরাচর যেত না।

আচার্য গুনিন মানুষ তো। দিনরাত নেশায় চুর হয়ে থাকতেন। সন্ধে হলেই ভূতের কাঁধে চেপে যেতেন হরারডাঙায়। হরিহরডাঙার চটানে।

সেখানে একদল ভূত এসে জমত।

কালো কালো ছায়া ছায়া ভূতেরা, আলোর রেখার মতো কঙ্কালের দল ঝুপঝাপ করে গাছের ডাল থেকে নেমে আসত।

শ্মশানের শ থেকে উঠে আসত কায়াহীন ছায়ারা।

আচার্যি গাঁজার কলকেটা এগিয়ে দিয়ে বলতেন, "এটা ঠিক করে সেজে দে।"

অমনি একজন সেটা হাত নিয়ে সাজতে বসত। শ থেকে ফুঁ দিয়ে আগুন বের করে ধরাত। তারপর বলত, "এই নে খা। একটু পেসাদ আমাদেরকেও দিস আচার্যি।"

আচার্যি একটা টান দিয়ে ভূতদের হাতে তুলে দিতেন সেই কলকেটা। তারপর সেটা হাতে হাতে ঘুরত।

আড়ালে আবডালে লুকিয়ে এ দৃশ্য যারা দেখত তারা এসে গল্প করত অন্যদের কাছে। সকলে অবাক হয়ে যেত শুনে। চোখদুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠত।

পেঁচোয় পেয়েছে একটা ছেলেকে। কখনও নীল, কখনও লাল হয়ে যাচ্ছে।

সবাই বলল, "ও ছেলে বাঁচবে না। চারদিনের ছেলে। বাঁচে কখনও ?"

খবর গেল আচার্যির কাছে।

বললেন, "বাঁচবে না মানে ? আমি বাঁচাব ওকে।"

সবাই কেঁদেকেটে পায়ে ধরল আচির্যির, "দয়া করুন আচার্যিমশাই।"

"দয়া তো করছি রে বাবা বলছি তো বাঁচাব। আজ মাঝরাতে ছেলের মাকে একলা যেতে বলবি শ্মশানে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে শুধু তারপর আমি আছি।

"একলা যাবে? ভয় করবে না বাবা ?"

"ভয় করলে তো চলবে না। ছেলেকে বাঁচাতে গেলে সাহস করে যেতে হবে।

যেতে যখন হবেই তখন যাওয়া হল।

ছেলেকে বুকে নিয়ে ছেলের মা একলা চলল হরারভাঙার চটানে!

বাবুর মায়ের খালেল ধারে আসতেই কে যেন বলল, "তুই ওখানেই বোস মা। ছেলেটা দে।"

ছেলের মা খালের ধারে বসে পড়ল।

“দে। ছেলেটা দে।”

ছেলের মা তো অবাক! কাউকেই তো সে দেখতে পাচ্ছে না। দেবে কাকে?

“ছেলেটাকে তুলে ধর। আমি নিয়ে নিচ্ছি।”

ছেলেকে তুলে ধরল মা।

অমনি কোথা থেকে দুটো হাত এসে নিয়ে নিল ছেলেটিকে।

লক্ষ্মী আচার্যি শ্মশানে ছিলেন।

সেই হাতদুটো ছেলেটাকে নিয়ে আচার্যির পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল।

আচার্যি বললেন, “এখানে রাখলি কেন, শ-এর ওপর শুইয়ে দিয়ে আয়।”

অমনি পেছন থেকে ছেলের মা কেঁদে উঠে বলল, “না না। আঁতুড়ের ছেলে। ওকে শ-এ শোয়াবেন না আচার্যিমশাই। কচি গা। বড় লাগবে।”

আচার্যি গম্ভীর গলায় বললেন, “তুই এখানে এলি কেন ? তোকে না খালের ধারে বসতে বললাম।”

“ক্ষমা করুন আমাকে! আমি থাকতে পারলুম না।”

আচার্য বললেন, “ঠিক আছে। এসেছিস যখন, বোস। কথা বলবি না। উঠবি না।” তারপর কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন, “কই রে! যা, শ-এর ওপর রেখে আয় ওকে।”

অমনি সেই হাতদুটো ছেলেটাকে তুলে নিয়ে রেখে এল শ-এর ওপর। ছেলে তো নয়, লাল রক্তমাংসের ডালা একটি। কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার গায়ের রং।

ছেলের মা অধীর আগ্রহে বসে রইল।

রাত যখন শেষ হয়ে আসছে, আচার্য তখন ছেলের মাকে বললেন, “যা। এবার তোর ছেলে নিয়ে তুই ঘরে চলে যা।”

মা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

"উঁহুঁ।উঠো না। বোসো।" বলে শ-এর দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে ডাকলেন "আয় উঠে আয়" ।

মা তো অবাক! চারদিনের ছেলে উঠে আসবে কী!

কিন্তু উঠে এল ছেলেটি।

আচার্যির ভেলকিতে সবকিছুই সম্ভব হয়।

চারদিনের ছেলে পা পা করে এগিয়ে এসে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ল। আচার্যি বললেন, "যাঃ! খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা। আর কোনও ভয় নেই। সাবধানে রাখিস। কাল একটা মাদুলি করে দেব। সেটা ছেলের গলায় পরিয়ে দিবি।"

ছেলের মা ছেলে নিয়ে চলে গেল।

লক্ষ্মী আচার্যির যশের ধারা গড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে।

এইভাবেই দিন যায়। একদিন আচার্য যখন হরারডাঙায় যাচ্ছিলেন, পালকি বইতে বইতে ভূতেরা তখন বলল, "আচ্ছা গুনিন—।"

গুনিন তখন নেশায় চুর, "কী রে!"

"আচ্ছা, তুই এত সাহস পেলি কোত্থেকে রে?"

"কেন, আমার মা ব্রহ্মময়ীর কাছ থেকে পেয়েছি।"

"সত্যি গুনিন, তোর মতো সাহসী লোক একজনও দেখিনি আমরা। আচ্ছা, তোর কি কোনও কিছুতেই ভয় করে না? এই যে আমাদের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াস, হাজার হলেও মানুষ তো তুই?"

"নাঃ। তোরা দেখছি ভূত তো ভূত। ভয় থাকলে কখনও তোদের কাঁধে চেপে ঘুরে বেড়াই ?"

"তা বটে। তা বটে।" "কিন্তু তোদের মতলবটা কি বল তো? আজ হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করছিস যে ?"

"না। মতলব আর কি! হাজার হলেও তুই আমাদের মনিব। তাই জিজ্ঞেস করছিলুম যদি তোর কোনও কিছুতে ভয়ডর থাকে তবে সে ভয়টা আমরা ভেঙে দেব। এই আর কি।"

এই কথা রোজই হয়। আচার্যি বলেন, "তোরা ব্যাটারা জ্বালিয়ে মারলি। আমার আবার ভয় কী?" ভূতেরা বলে, "বল না গুনিন ?" আচার্যি বলেন, "আমি কাউকে ভয় করি না। কোনও ব্যাটাকে ভয় করি না।" ভূতেরা চুপ করে যায়। অন্যদিনের মতো সেদিনও সন্ধের পর ভূতেরা আচার্যির পালকি বয়ে আনছিল। আচার্যি সেদিন দারুণ নেশা করেছিলেন। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তা সত্ত্বেও সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি শ্মশানে যাচ্ছিলেন জপ করতে।

অন্যদিনের মতো সেদিনও ভূতেরা বলল, "বল না গুনিন, তোর কীসে ভয় ?"

আচার্যি বললেন, "ভয় আবার কীসের ?"

"বল না বাবা ?"

নেশায় আরক্ত চোখদুটিকে একবার চারদিকে ঘুরিয়ে আচার্যি বললেন, "একান্তই শুনবি তা হলে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনব।"

"ভয় অবশ্য তেমন কিছু নয়। তবে—।"

"তবে?"

"তবে কি?"

বল না ?" "শ্মশানে নামবার মুখে যে শ্যাওড়া গাছটা আছে, দেখেছিস ?"

"হা হা। ওই গাছের ডালে তো শশধর নাপিত গলায় দড়ি দিয়েছিল?"

"হ্যা। ওই শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে একটা হুট ট্যাঁটারু পাখি ডেকে ওঠে?"

"ডাকে। রোজ ডাকে।"

“ওই পাখিটা যখন আচমকা ডেকে ওঠে তখন কেন জানি না আমার বুকের ভেতরটা ছাতি করে

"এ হে। এই কথা তা আমাদের আগে বলিসন কেন গুনিন। দেখ না আজই ব্যাটাকে শেষ করে দিচ্ছি।”

“দিবি? তাই দে, একেবারে খতম করে দে ব্যাটাকে।”

“ সে-কথা আবার বলতে ?”

কিছুক্ষণ পরেই হরারডাঙা এসে গেল। আর চরের ঢালে শ্মশানে নামার মুখেই বিপর্যয়টা ঘটে গেল হঠাৎ

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বনবাদাড়ের ভেতর থেকে পাখিটা বিকট স্বরে ডেকে উঠল সেদিনও—হু-হু-হুট-ট্যা-ট্যাঁ—।”

চমকে উঠলেন গুনিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কেউ যেন তাঁর পাকিটাকে দেশলাইয়ের খোলের মতো ছুড়ে ফেলে দিল।

আমনই কোটি কোটি গলায় কারা যেন ভীষণ রবে ডেকে উঠল সেই পাখিটার স্বর নকল করে—হু-হু-হুটু-ট্যা-ট্যা। হুটু-টা ট্যা। হুটু-ট্যাঁ—।

শুধু তারা নয়, আশপাশ থেকে চারদিক থেকে তখন সে কি হাসি। হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ । আর আর্তনাদ—আ-আ-আ। আ-আ-আ—

শ্মশানের শ থেকে যেন হাজার হাজার কায়াহীন ছায়ারা সব এলোমেলো উঠে দাঁড়াল। গুনিন বুঝতে পারলেন আজ আর তাঁর নিস্তার নেই। নেশার ঘোর কেটে গেছে তখন। বুক টিপ ঢিপ করছে ভয়ে। ছিটকে পড়ে গিয়ে সারা গায়ে হাতে কী অসহ্য যন্ত্রণা। কোমরের অস্থিসন্ধিটাও ভেঙে গেল নাকি? বুকটা ভিজে ভিজে ঠেকছে। বোধ হয় নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। আচার্য দেখতে পেলেন, দুটা ে আধপোড়া হাত ক্রমশ ধীরে ধীরে তাঁর গলার কাছে এগিয়ে আসছে!

ময়রা সিংহের ভূতের গল্প

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

গল্পটা শুনেছিলুম ময়রা সিংহের মুখ থেকে। ময়রা সিংহ আমাদের গ্রামের লোক। তার আসল নাম নির্মল সিংহ। ময়রার কাজ করত বলে লোকে তাকে ময়রা সিংহ বলত। গ্রামের মধ্যে ছোটখাটো একটা মিষ্টির দোকানও ছিল তার। ময়রা সিংহ মরে যাওয়ার পর সে দোকান উঠে গেছে। তবে তার মুখে শোনা গল্পটা আজও মনে আছে আমার।

আমাদের গ্রাম থেকে বেরোবার মুখে কুলির (রাস্তা) ধারে একটা বেলগাছে নাকি এক ভূত থাকত। ভূতটা কারও কোনও অনিষ্ট করত না। কাউকে ভয় দেখাত না। শুধু সন্ধের পর গাছের ডালে বসে পা দোলাত আর সেই গাছতলা দিয়ে কেউ গেলেই তার মাথায় একটি লাথি মেরে দিত।

দিনের পর দিন এইরকম ভুতুড়ে ব্যাপার নিয়মিত ঘটত বলে ভয়ে সন্ধের পর কেউ আর সে পথে পা বাড়াত না। কেননা বেলগাছটা ছিল কুলির ধারেই এবং বেলগাছের যে ডালে ভূতটা থাকত সেই ডালটা ছিল কুলির ওপর ঝুঁকে। তাই কুলি ছেড়ে অন্য পথেই লোকজন যাতায়াত করত।

ভূতটাকে তাড়াবার জন্য গাঁয়ের লোকেরা অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ওঝা গুনিন ডেকে নানারকম ক্রিয়াকলাপ করেও তাড়ানো যায়নি ভূতটাকে। অনিষ্ট হওয়ার ভয়ে গাছটাকে কেটে ফেলতেও সাহস করেনি কেউ। এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন আগুরিদের একটা লোক ঠিক করল যেমন করেই হোক ভূতটাকে ফাঁদে ফেলে সে জব্দ করবে। লোকটার নাম মৃত্যুঞ্জয়। ডাকনাম মৃত্যুন। সে ছিল যেমন বলবান তেমনই সাহসী। কথায় বলে

সাতটা এড়ে গোরুর যা শক্তি, একজন আগুরির গায়ে সেইরকম শক্তি। তাই মৃত্যুনের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল না কেউ। দু-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী করে কী করবে শুনি ?"

মৃত্যুন বলল, "শুনেছি গোরুর দড়িতে ভূত নাকি বাঁধা পড়ে। সেই গোরুর দড়ি দিয়েই ভূতটাকে আমি বাঁধব।" এই বলে ভূতটাকে কায়দায় ফেলবার জন্য মৃত্যুন আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিল।

তারপর একদিন রাত্রিবেলা শুরু হল তাদের ভূত ধরার অভিযান। ময়রা সিংহের দোকানটা হল ঘাঁটি। দোকানে খাওয়াদাওয়ার জন্য লুচি মণ্ড ইত্যাদি তৈরি হতে লাগল। মৃত্যুন বলল, "এইবার শুরু হোক আমাদের কাজ। কিন্তু এ কাজের জন্য চাই একটা শক্ত দড়ি আর দুটাে তেজি বলদ।"

একজন বলল, "দড়ি তো জোগাড় হয়েছে, কিন্তু বলদ কোথায় পাব?"

"কারও কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো।"

"কিন্তু ভূতের সঙ্গে বোঝাপাড়ার জন্য বলদ দিতে কি বাজি হবে কেউ"

মৃত্যুন কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "কেউ না দেয়, কোথাও থেকে চুরি করেও আনতে হবে।"

তাই হল। চুরি করেই আনা হল। পূর্বপাড়া থেকে লুকিয়ে একজনের বলবান দুটো বলদ নিয়ে আসা হল।

তারপর শুরু হল আসল কাজ।

একটা দড়ির মাঝখানে ফাঁস তৈরি করে দড়ির দুদিকের খুঁট দিয়ে বলদ দুটোকে বেঁধে ফাঁসটা মাথার ওপর ধরে মৃত্যুন একা চলল কুলি ধরে সেই গাছতলার দিকে।

ভূতটা তখন নিজের মনে গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছিল। এমন সময় মৃত্যুন এসে পড়ল সেই গাছতলায়। যেই না এসে পড়া অমনই মাথার পোকা

নড়ে উঠল ভূতটার। সে করল কি, তার স্বভাবমতো মৃত্যুনের মাথার ওপর মেরে দিল এক লাথি।

মৃত্যুন তো এইরকমই চেয়েছিল। ভূতটা তার মাথায় লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসটা টেনে দিল সে। তারপর আর কোনওদিকে না তাকিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়ে উঠল এসে ময়রা সিংহের দোকানে।

সেখানে মৃত্যুনের জন্য যারা অপেক্ষা করছিল, মৃত্যুন তাদের নিজের কীর্তির কথা বলল। বলে সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে খেতে লাগল লুচি, মণ্ডা ইত্যাদি।

ওদিকে ভূতটাও তখন গোরুর দড়িতে বাঁধা পড়ে বেশ রীতিমতো জব্দ হয়ে গেছে। গোরুতে ভূত চেনে। ওরা নাকি অশরীরী হলেও ভূতকে দেখতে পায়। তাই তাদের দড়িতে একটা আস্ত ভূতকে বাঁধা পড়তে দেখে বলদ দুটো তো ভয়ানক হাঁকডাক করে ছুটোছুটি করতে লাগল। একই দড়ির দুদিকের খুঁটে বলদ দুটো বাঁধা। মাঝের ফাঁদে আটকে রইল ভূত। বলদ দুটাে ভয় পেয়ে যত ছোটে, তাদের টানাটানিতে ভূতের বাঁধনটা তত বেশি শক্ত হয়।

এইভাবে প্রায় সারারাত ধরেই হাঁকডাক ও ছুটোছুটি চলতে থাকে। সারা গ্রাম তোলপাড় হয়।

মৃত্যুন ও তার লোকজনেরা ময়রা সিংহের দোকানে বসে সব শোনে। বলদ দুটাে কখনও এ পাড়ায়, কখনও ও পাড়ায় ছুটােছুটি করে বেড়ায়। তাদের ডাক কখনও খুব কাছ থেকে শোনা যায়, কখনও বা শোনা যায় দূর থেকে। ক্রমে একসময় আর শোনাই যায় না তাদের ডাক।

রাত্রি তখন শেষ হয়ে আসছে।

মৃত্যুন তার লোকেদের বলল, "এবার তো একবার দেখতে হয়। কেননা ভূতটা কী অবস্থায় আছে দেখে যাদের বলদ তাদের ফেরত দিয়ে আসতে হবে

তো! না হলে কাল সকালে জনাজানি হয়ে গেলে পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা বেঁধে যাবে।”

একজন বলল,"এই অন্ধকারে কোথায় খুঁজব?”

“একটা আলো নিয়ে চলো না দেখি সবাই মিলে।”

মৃত্যুনের কথামতো একটা লন্ঠন নিয়ে সাবাই চলল বলদ খুঁজতে। এদিক-সেদিক করে নানাদিক খুঁজে একসময় তারা গ্রামের প্রান্তে হাজির হল।
গ্রামের প্রান্তে চাঁদের পুকুর নামে একটা পুকুর আছে।

ওরা দেখল সেই পুকুরের পায়ে একইভাবে বাঁধা অবস্থায় বলদ দুটো শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর তাদের দড়ির ঠিক মাঝখানের ফাঁসে বাঁধা রয়েছে একটা আধপোড়া কাঠ। এই কাঠটার মধ্যেই যে ভূতটা ভর করে ছিল তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। তাই সকলে মিলে তক্ষুনি ভাল করে পুড়িয়ে ফেলল কাঠটাকে। তারপর কাঠপোড়ার সমস্ত ছাই চাঁদের পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়ে বলদ দুটোকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এল।

ভূতের উৎপাতও বন্ধ হয়ে গেল সেদিন থেকে। গাঁয়ের লোকেরা আবার নিশ্চিন্ত হয়ে সেই পথে চলাফেরা করতে লাগল।

আজাহার-মথুরার গল্প

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান সদরঘাটে দামোদর নদের বিস্তীর্ণ বালুকাবেলার ওপারে পলেমপুর নামে একটা গ্রাম আছে। পলেমপুরের পূর্বনাম ছিল পালোয়ানপুর। এখন কিন্তু পালোয়ানপুর বললে কেউ চিনতেই পারবে না। বলবে, "পালোয়ানপুর ? সি কোন্ গেরাম বটে?" তবে প্রবীণ যারা, তারা অবশ্য সে-কথা বলবে না। শুধু বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করে দুঃখ-সুখের হিসেব-নিকেশ করবে।

এই পালোয়ানপুর গ্রামে আজাহার আর মথুরা নামে দু'জন পালোয়ান থাকত। আজাহার ছিল মুসলমান। মথুরা ছিল হিন্দু।

আজাহারের আসল বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার এক গ্রামে। আর মথুরা ছিল বর্ধমান জেলারই লোক। মথুরার পূর্বপুরুষরা এই বর্ধমান জেলাতেই পালোয়ানপুরে জন্মেছে, মরেছে। তবে মানুষের মতো মানুষ হয়ে থাকেনি তারা। ঠাঙাড়েগিরি করে, ডাকাতি করে জীবন কাটিয়েছে। কাজেই মথুরাও সেই রক্তের ছেলে হয়ে মস্ত বীর হয়ে উঠল।

সোনারুন্দীর জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে মথুরার বাবার সঙ্গে আজাহারের বাবা কাশেম আলির পরিচয় হয়। ব্রিটিশ তখন রাজত্ব করছে এদেশে। সেই সময় কোনও এক ক্ষেত্রে ডাকাতির অভিযোগে কাশেম আলি ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। মথুরার বাবা তখন আজাহারকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং মথুরার সঙ্গে অপত্যস্নেহে লালনপালন করেন।

আজাহার আর মথুরা দুজনে একসঙ্গে বড় হওয়ায় অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠল। দুজনেই হয়ে উঠল বীরের মতো বীর। চেহারা হল বুনো মোষের মতো।

তবে দিনকাল খারাপ হওয়ায় ডাকাতির জাতব্যবসা তারা ধরল না। তারা গেল অন্য পথে। শরীরের মধ্যে আসুরিক শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল তারা।

গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে কুস্তির আখড়া হল তাদের। সেইখানে চলল নিষ্ঠার সঙ্গে দুজনের শক্তিসঞ্চয়ের মহড়া। ডন বৈঠক দিয়ে, মুগুর ভেজে, কুস্তি করে অল্পদিনের মধ্যেই দুজনে দু-দুটাে অসুর হয়ে দাঁড়াল।

যখন তারা বুঝল যে, তাদের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই, তখন একদিন আজাহার বলল, "চল মথুরা, এইবার আমরা ঠ্যাঙা-লাঠি ধরে চারদিক দাপিয়ে বেড়াই।"

মথুরা বলল, "না। আমার মাথায় অন্য এক মতলব আছে।"

"চুরি ডাকাতি বড় বাজে কাজ। ও কাজ আর করব না।" "তা হলে কী করবি বল? একটা কিছু তো করতে হবে?" "হ্যাঁ। সেই একটা কিছুর বুদ্ধিই আমার মাথায় এসেছে। আর সে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারলে আমাদের পেটও ভরবে, খাতিরও পাব। বেশ বুক ফুলিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াব আমরা।"

আজাহারের আর তর সইছিল না। বলল, "বলিস কী রে! তা এরকম মতলব যখন মাথায় এসেছে তখন বলেই ফেল কী করতে চাস ?"

মথুরা বলল, "আমরা দিগ্বিজয়ে বেরোব।"

আজাহার হতাশ হয়ে বলল, "দুর। তাতে কী হবে ?"

মথুরা বলল, "আরে! আগে শোনই না, কী বলতে চাই।"

"বল।"

"আমরা দিগ্বিজয়ে বেরোব মানে কী? একেবারে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়াব। অর্থাৎ আমরা এমন চ্যালেঞ্জ নেব যে, তাতে আমাদের দু'জনের বাজিমাত হবেই।"

“বটে!”

“হ্যাঁ।”

“সেই চ্যালেঞ্জটা কী শুনি ?”

“চ্যালেঞ্জটা হল, আমরা চারদিকে রটিয়ে দেব যে আমরা প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে সেখানকার মস্তানদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই। শামিয়ানা খাটিয়ে সকলের চোখের সামনে লড়াই হবে আমাদের। সেখানে শক্তিপরীক্ষায় যদি কেউ আমাদের হারাতে পারে তবে আমরা তার কাছে দাসখত লিখে নতিস্বীকার করে চলে আসব। আর যদি না পারে তবে সেই গ্রামের লোকদের আমাদের কাছে বশ্যতাস্বীকার করে রুপোর মেডেল ঝুলিযে দিতে হবে আমাদের গলায়।

মেডেলের গায়ে সেই গ্রামের নাম খোদাই করা থাকবে। লেখা থাকবে আমরা পরাজিত।”

আজাহার বলল, “শুধু তাই নয়। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়ে আসব।”

মথুরা বলল, “না, তা করব না। সেই পরাজয়ের খেসারত স্বরূপ নগদ একশো টাকা দিতে হবে তাদের।”

আজাহার তো লাফিয়ে উঠল শুনে, “মা-শা-আল্লা। মা-শা-আল্লা। ঠিক বলেছিস ভাই।”

মথুরা বলল, “এতে আমাদের পেটও ভরবে, টাকাও হবে। ডাকাতির চেয়ে বরং বেশি রোজগার হবে এতে। লোকে আমাদের ঘৃণা না করে ভক্তি করবে। পুলিশও পেছনে লাগবে না। বেশ বহাল তবিয়তে রাজত্ব করব আমরা। আর যেখানে যে দেশেই যাই না কেন, জয় আমাদের হবেই।”

আজাহার বলল, “বটেই তো! কে পারবে আমাদের সঙ্গে ?”

মথুরা বলল, “আমি তো আমার এই সাঁড়াশির মতো হাত দুটাে দিয়ে যাকে ধরব তাকে একেবারে বেঁকিয়ে দেব।”

আজাহার বলল, “আর আমি করব কি, আমার এই এক হাতে যার মাথাটা একবার ধরব, আমার হাতের ভেতরেই তার মাথাটা গুড়িয়ে একেবারে ছাতু করে দেব।”

আজাহার আর মথুরা দুজনেই মনে মনে এই ফন্দি এঁটে লোকমুখে সেই কথা সব জায়গায় প্রচার করে দিল। একেই তো আজাহার মথুরার গায়ের জোর এত বেশি ছিল যে, সেই ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। তার ওপরে তাদের এই প্রস্তাবের কথা শুনে ভয়ে পিলে শুকিয়ে গেল আশপাশের গ্রামের লোকদের।

আজাহার, মথুরার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় জয়লাভ করতে হবে। কিন্তু সেই পরীক্ষায় এগোবে কে? যমের মতো অমন দু-দু’জন মূর্তিমান বিভীষিকার সামনে গিয়ে কে দাঁড়াবে?

কেউ সাহস করে না। গ্রামে গ্রামে তখন স্যাকররা গিয়ে রুপোর মেডেল তৈরি করতে বসল। সোনার চেনে গাঁথা হবে সেই রুপোর মেডেলের মালা। সেই মালা দুলবে আজাহার আর মথুরার গলায়। রোদ লেগে, আলো লেগে ঝলমল করবে সেই মালা।

গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলতে শুরু করল। কেননা শুধু মেডেল দিলেই তো হবে না। তার সঙ্গে সেলামি বা প্রণামী হিসেবে দিতে হবে একশো টাকা।

না দিয়ে উপায়ই বা কী ? দু-দু’জন অসুরের হাতে বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে নতিস্বীকার করা অনেক ভাল। আজাহার মথুরার মতো বীর কালেভদ্রে জন্মায়। অতএব জেনেশুনে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আজাহার, মথুরা প্রথমেই গেল সগরাইতে। এখান থেকে দুটো রাস্তা বেঁকে গেছে দুদিকে। বাঁ হাতি রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ছোট বৈন্যান, রায়না আর কারেলাঘাটের দিকে। তারপর আর পথ নেই। দামোদর পার হয়ে উঠতে হবে

জামালপুরের ঘাটে। আর ডান হাতি, মানে সোজা দক্ষিণমুখে রাস্তাটা চলে গেছে একলক্ষ্মী, বুলচাঁদ, মোগলমারি হয়ে জাহানাবাদ (আরামবাগ)। আজাহার মথুরা ঠিক করল, সগরাই হয়ে সেয়ারাবাজার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে জাহানাবাদের দিকে চলে যাবে। এই ভেবে সগরাইতে গিয়ে উঠল তারা।

সগরাই গ্রামের লোকেরা তো ভয়েই অস্থির। যাই হোক, রাত্রিবেলা মস্ত শামিয়ানার নীচে আজহার, মথুরা হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াল। ঢাক আর কাঁসিতে বাজনা উঠল লড়াইয়ের। আসরে মাথা হেঁট করে ঢুকল ভুবন সর্দার। ভুবন সর্দার এ অঞ্চলের নামকরা ডাকাত।

আজাহার বলল, "কী সর্দার! লড়বে নাকি ?"

ভুবন বলল, "না হুজুর"

মথুরা বলল, "সে কী!"

ভুবন বলল, "আমি আপনাদের দাস।"

আজাহার সকলকে শুনিয়ে বলল, "তোমরা শোনো হে, বিখ্যাত ভুবন সর্দার বলছে সে নাকি আমাদের দাস।"

সবাই বলল, "আমরা সাক্ষী। আমরাও আপনাদের কাছে আমাদের নতিস্বীকার করছি।"

মথুরা বলল, "তা হলে নিয়ে এসো আমাদের রুপোর মেডেল।" আজাহার মথুরার গলায় আংটা দেওয়া সোনার চেন ছিল। তাতে এঁটে দেওয়া হল রুপোর মেডেল। একটা আজাহারকে। একটা মথুরাকে।

মথুরা ভুবন সর্দারকে বলল, "এরকম ক্ষমতা নিয়ে তুমি মানুষ মারো সর্দার।"

"কী করব! এ যে আমাদের জাত ব্যবসা।"

আজাহার বলল, "ঠিক আছে। এবার থেকে এ ব্যবসা ছেড়ে অন্য কিছু করো। মনে রেখো এটা তোমার প্রভুর আদেশ।"

"হুজুর মা বাপ।"

বলে ভুবন তার লাঠি মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, "এই নামালাম লাঠি। আর এ-কাজ করব না।"

আজাহার, মথুরা এবার গেল আমলেতে। আমলের মোনা ঘোষ আর পোনা পান ছিল নামকরা পালোয়ান। যেমন শক্তিমান, তেমনই দুর্ধর্ষ।

আমলে বাজারে লড়াইয়ের আসরে দু'পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়াল।

একদিকে আজাহার, মথুরা।

অপরদিকে মোনা, পোনা।

আজাহার বলল, "কী রে মোনা, লড়বি নাকি ?"

মোনা বলল, "আলবত।"

মথুরা পোনাকে বলল, "তুই?"

"এক হাত হয়ে যাক না! মন্দ কি?"

আজাহার, মথুরা বলল, "এখনও ভেবে দ্যাখ।"

মোনা, পোনার এ অঞ্চলে খাতির ছিল খুব। কাজেই কিছুতেই তার হার স্বীকার করতে সাহস পাচ্ছিল না। অথচ মুখে বললেও ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল তাদের। বলল, "ব-ব-বললুম তো।"

আজাহার, মথুরা বলল, "তোরা তো এখনই তোতলাতে শুরু করেছিস। এর পরে কী করবি ?"

দর্শকদের ভেতর থেকে একজন বলল, "এর পরে পাঁকে শুয়ে গড়াগড়ি খাবে।" মোনা, পোনা বুঝল হাওয়া খারাপ। বলল, "না ভাই। সাহস পাচ্ছি না। ক্ষমা করো তোমরা। আমরা হারস্বীকার করছি। শুধু তাই নয়, বরাবরের জন্য এ গ্রাম ছেড়েও চলে যাচ্ছি আমরা। কেননা পরাজয় স্বীকার করে এ গ্রামে মাথা উঁচিয়ে আমরা আর থাকতে পারব না। শুধু গ্রামে কেন, এ তল্লাটে থাকতে পারব না।"

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদি তুমুল ভাবে বেজে উঠে আজাহার-মথুরার জয় ঘোষণা করল।

গ্রামের লোকেরা আজাহার-মথুরার পায়ের তলায় একশো টাকা রেখে গলায় ঝুলিয়ে দিল সেই রুপোর মেডেল। তারপর সারারাত ধরে আজাহার মথুরাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে চারদিক প্রদক্ষিণ করল।

পরদিন আজাহার, মথুরা আবার রওনা হল অন্য দেশের দিকে।

আজাহার, মথুরার নামে তখন এমন বিভীষিকা লেগে গেছে চারদিকে যে, কোনও পালোয়ানই আর মাতব্বরি করতে সাহস পায় না। যে শোনে আজাহার, মথুরার নাম, সেই গা-ঢাকা দেয়।

অতএব লড়াই আর হয় না।

আজাহার, মথুরা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে, মেডেল ঝুলিয়ে ঘুরতে থাকে। দেশ দেশান্তরে তখন নাম ছড়িয়ে পড়েছে তাদের।

তাদের নিয়ে মুখে মুখে ছেলে-ভুলানো ছড়াও বেরিয়ে গেল কত। ছড়া শুনে দুষ্ট ছেলেরা কান্না ভুলে মায়ের বুকে মুখ লুকোতো। যেই কেউ বলত ওই আজাহার আসছে, ওই মথুরা আসছে, অমনি ছেলেমেয়েরা ভয়ে মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরত।

যাই হোক, আজাহার, মথুরা এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঊচালনের প্রান্তে এসে হাজির হল।

ঊচালন হল বর্ধমান জেলারই অন্তর্গত একটি গ্রাম। বাঁধা সড়ক ধরে সোজা গ্রামের ভেতরদিকে চলে গেছে একটা রাস্তা। সেই রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নীচে বসল দুজনে।

তখন গ্রীষ্মকাল। বেশ ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। আজহার, মথুরার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল সেই শীতল বাতাসে। গাছের ডালে ডালে পিক পিক করে পাখি ডাকছে। কত রংবেরঙের পাখি।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে। ক্লান্ত পাখিরা আসছে গাছের ডালে আশ্রয় নিতে। কলবল কিচিরমিচির করে তারা সারাদিনের সুখ-দুঃখের কথা বলছে।

আজাহার বলল, "বেশ জায়গাটা না ?"

মথুরা বলল, "হ্যাঁ।"

আজাহার বলল, "এবার কিন্তু একঘেয়ে লাগছে সব। যেখানেই যাই সেই একই ব্যাপার। কেউ আর লড়াই করতে চায় না। নাম শুনলেই ভয়ে পালায়। নয়তো নতিস্বীকার করে।"

মথুরা বলল, "কে লড়বে বল? তাদের আর দোষ কী ? ভয়েই তো পিলে শুকিয়ে যায় সব। আমাদের এমন অমানুষিক শক্তির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ লড়তে কি কেউ পারে?"

"তাই তো বলছি। আর ভাল লাগছে না। অনেক টাকা হয়ে গেছে আমাদের। এগুলো বাড়িতে পৌছে দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে বেরনো যাবে।"

"তা অবশ্য মন্দ বলিসনি।"

"আজ এই গ্রামে চ্যালেঞ্জ সেরে কাল বরং ফেরা যাবে কী বল ?"

"হ্যাঁ, তাই।"

আজাহার, মথুরা বিশ্রাম সেরে গ্রামে ঢুকবে ভাবছে এমন সময় দেখতে পেল রোগা বেঁটে কালোমতো একটা লোক নিজের মনে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটিকে দেখতে পেয়ে আজাহার ডাকল, "ও ভাই, শোনো?"

লোকটি উত্তরও দিল না। ফিরেও তাকাল না।

আজাহার আবার ডাকল, "ও ভাই... ?"

মথুরা ডাকল, "এই যে! শুনছ?"

লোকটি এবার গান থামিয়ে শিস দিতে দিতে ওদের কাছে এগিয়ে এল। তারপর মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়ে দু'হাত কোমরে রেখে কায়দামাফিক ভাবে দাঁড়িয়ে বলল, "আমায় ডাকছেন ?"

আজাহার বেশ ভারিক্কি গলায় বলল, "হ্যাঁ। তোমাকেই ডাকছি। কেননা এখানে তুমি ছাড়া তো আর কেউ নেই।"

"কী দরকার বলুন?"

মথুরা বলল, "তুমি কি এই গ্রামেরই লোক ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী নাম তোমার ?"

"আমার নাম বাঁকা।"

"বাঁকা! সে আবার কী নাম ?"

"এরকমই নাম। আমি নামেও বাঁকা, কাজেও বাঁকা। বাগদিপাড়ায় থাকি। সবাই আমাকে বাঁকা বাগদি বলে।"

মথুরা বলল, "বেশ। তা দেখে তো তোমাকে বেশ ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে।"

"আজ্ঞে ভাল লোক আমি মোটেই নই। আমার সঙ্গে কারও বনে না। আমার সঙ্গে কেউ বেগড়বাই করলেই আমি তার সঙ্গে বাঁকা ব্যবহার করি।"

"সে তো খুব ভাল। তা বলছিলাম কি, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আজ রাত্রে তোমাদের গ্রামে অতিথি হতে চাই।"

"খুব ভাল কথা। অতিথি হন। কোনও আপত্তি নেই।'

"মথুরা বলল, "তা তুমি গ্রামে গিয়ে একটু খবর দিতে পারো ?"

"অতিথি হবেন এর জন্য খবর দিতে কে যাবে? গ্রামে যান। যার বাড়ি ইচ্ছে উঠুন। কেউ না করবে না। অত্যন্ত্য অতিথিবৎসল গ্রাম আমাদের।"

মথুরা বলল, "তবু যাও না। গিয়ে একটু খবর দিয়ে এসো না ভাই?"

লোকটি বেশ প্রসন্ন হয়ে বলল, "আচ্ছা যাচ্ছি। এত করে বলছেন যখন।" বলে সে যাওয়ার উপক্রম করতেই আজাহার বলল, "ওহে শোনো ?"

লোকটি ফিরে তাকাল, "বলুন।"

"আর একটা কথা বলব তোমাকে।"

"আবার কী কথা?"

"তোমাদের গ্রামে যদি তেমন পালোয়ান গোছের কোনও লোক থাকে, তবে তাকেও একটু তৈরি থাকতে বোলো।"

লোকটি এবার অবাক হয়ে বলল, "কেন ?"

আজাহারের কথায় লোকটির এবার সন্দেহ হল খুব। সে আর একটু কাছে এগিয়ে এসে কপালটা ঈষৎ কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

আজাহার বলল, "মানে অবশ্য একটাই আছে। সে তোমার জানবার দরকার নেই। যাও, তুমি গ্রামে গিয়ে খবর দাও।"

লোকটি বলল, "সে আবার কেমন কথা! আপনারা কে, কী আপনাদের পরিচয়, কিছু না জেনে আমি তো গ্রামে যাব না।"

"সে তোমার জানবার কোনও দরকার নেই।"

"দরকার নেই মানে? আপনারা অতিথি হতে চাইছেন ভাল কথা। কিন্তু অতিথি হয়ে আবার লড়াই করবার প্রস্তাব করছেন কেন? আগে আপনাদের পরিচয় দিন। তারপর গ্রামে যাব।"

আজাহার বলল, "আমাদের পরিচয় পেলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। যা বলি তাই করো।"

লোকটি রেগেমেগে বলল, “এঃ। অজ্ঞান হয়ে যাবে না হাতির মাথা হয়ে যাবে। আপনাদের পরিচয়টা দিয়েই দেখুন না, অজ্ঞান হই কি, কী হই, তখন দেখতে পাবেন।”

আজাহার বলল, “আমরা পালোয়নপুরের লোক। আমাদের নাম আজাহার, মথুরা।”

“তাতে কী হয়েছে?”

মথুরা বলল, “কেন, আমাদের নাম শোনোনি?”

“না। অমন বিটকেল নাম আমার বাবাও কখনও শোনেনি।”

মথুরা কটমট করে তাকাল লোকটির দিকে। ইচ্ছে হল এক ঘুসিতে লোকটার মুখটাকে ফাটিয়ে দেয়।

লোকটি বলল, “চোখ রাঙালে কী হবে? ও নাম শুনিনি। যাক। এবার আপনার অভিপ্রায়টা খুলে বলুন দেখি?”

লোকটির কথা শুনে আজাহারের মাথা তো গরম হয়ে উঠল। যাদের নাম শুনলে বাঘে গোরুতে ভয়ে এক ঘাটে জল খায় তাদের নাম জানে না এমন বেকুব কেউ যে কোথাও থাকতে পারে তা তাদের জানা ছিল না।

আজাহার আর মথুরার মধ্যে মথুরার মাথাটা ছিল একটু ঠাণ্ডা। সে অতিকষ্টে আজাহারকে শান্ত করে লোকটিকে তাদের উদ্দেশ্যের কথা এক এক করে সব খুলে বলল। সব শুনে লোকটি বলল, “ও এই কথা। তোমরা বুঝি দেশে দেশে গিয়ে এসব কাজ করে বেড়াচ্ছ? তা তোমরা তো একটি চড়েরও খদ্দের নও বাপু, তোমাদের আবার লড়াই করবার শখ কেন ?”

আজাহার রেগে বলল, “তুমি একটু মুখ সামলে কথা বলবার চেষ্টা করো।”

লোকটিও রেগে বলল, “কেন, ভয়ে নাকি? কে হ্যা তুমি যে, তোমার সঙ্গে মুখ সামলে কথা বলতে হবে ?”

আজাহার বলল, "আমাদের এই চেহারা দেখলে যমের বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, আর তুমি বলছ কিনা আমরা একটি চড়ের খদ্দের নই?"

"যা ঠিক তাই বলছি।" মথুরা ফিসফিস করে আজাহারকে বলল, "এই বেশি খচমচ করিস না এর সঙ্গে। ব্যাটার বোধ হয় মাথাখারাপ আছে।"

লোকটি সে-কথা শুনতে পেয়ে বলল, "মাথাখারাপ আমার নয়। মাথাখারাপ তোমাদের। এখনও বলছি ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও। নাহলে একবার যদি ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করি তো সহজে ছাড়ব না।"

এরপরে আর সহ্য করা যায় না। ছোট মুখে বড় কথা কে কবে সহ্য করেছে? আজাহারের সারা শরীরে যেন জ্বালা ধরে গেল। তেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। লোকটি চোখ রাঙিয়ে বলল, "আই! বেশি রোয়াব নেবে না।" মথুরাও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটির রাগ আরও বেড়ে গেল, "বড় গরম দেখছি যে। ওসব আমার কাছে দেখিয়ো না, বুঝেছ? এই উচালনের নামকরা মস্তান আমি। অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোককে ঘায়েল করে দিয়েছি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এক্ষুনি ঠাণ্ডা করে দেব।"

আজাহার, মথুরা তো ভেবেই পেল না লোকটির সত্যিই মাথাখারাপ কিনা। মথুরা ব্যঙ্গ করে বলল, "ওরে আজাহার, একটা ইদুরের গর্ত দেখ। গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। উনি আমাদের ঠাণ্ডা করে দেবেন।"

লোকটিও ধমকে উঠল অমনি, "চুপ কর, ব্যাটা বদমাশ কোথাকার! টিটকিরি মারছে আবার।"

মথুরা বলল, "দ্যাখো, আমরা অনেক সহ্য করেছি। আমি ইচ্ছে করলে এখুনি এক হাতে তোমাকে টিপে মেরে ফেলতে পারি।"

"তা মারো না। দেখব কত মায়ের দুধ খেয়েছ।"

"না। চুনোপুটি মারা আমাদের কাজ নয়, আর ছুঁচো মেরেও আমরা হাত গন্ধ করতে চাই না। যাও, যা বলছি শোনো। গাঁয়ে গিয়ে খবর দাও।"

লোকটি বেদম খেপে গেছে তখন। বলল, "খবরটবর শিকেয় রাখো। আগে আমার সঙ্গে মোকাবিলা হোক। তারপর খবর। আমাকে এক হাতে টিপে মারবে বলেছ যখন, মারো আগে। তারপর খবর!"

"ঘাঁটাবার কী আছে? মারব যখন বলেছ তখন মারো। তুমি আমাকে এক হাতে টিপে মারবে আর আমি তোমাদের দু'জনকে দুহাতে টিপে মারব। এসো, এগিয়ো এসো।"

আজাহার আর থাকতে পারল না এর পর। রেগে গিয়ে ঠাস করে লোকটার গালে মারল এক চড়। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে চড় খেয়ে বহু আচ্ছা আচ্ছা লোকেরও ভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে সেই চড় বেমালুম হজম করে লোকটি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আজহার, মথুরার ওপর। তারপর দুহাতে দু'জনকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ধানকাটা মাঠের মধ্যে।

সেই মহাশক্তিমান দু'দুটো মানুষ তো হতভম্ব হয়ে গেল। এও কি সম্ভব? এ যে বিশ্বাস করা যায় না !

লোকটির কিন্তু কোনও কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। মাঠে নামিয়েই শুরু করল তার খেলা। দুহাতে দুজনের চুলের মুঠি ধরে অবিরাম ঠোকাঠুকি শুরু করল। তার ওপর কিল, চড়, লাথি, ঘুসিও চলল বেপরোয়া ভাবে।

আজাহার, মথুরা অমন মার জীবনে খায়নি। মারের চোটে তারা তখন বাবা রে মা রে করতে লাগল।

লোকটি বলল, "কেমন আরাম লাগছে এবার? তখন বলেছিলুম না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা। ভালয় ভালয় ফিরে গেলেই পারতিস। যেমন গেলি না এইবার তার ফল ভোগ কর।"

আজাহার বলল, “লক্ষ্মী দাদা আমার। এবারের মতো রেহাই দাও আমাদের। আমাদের ঘাট হয়েছে ভাই।”

লোকটি বলল, “পাগল না মাথাখারাপ ? এত সহজে আমি ছাড়ি কখনও ? এই তো সবে শুরু।”

মথুরা বলল, “তোমার দুটি পায়ে পড়ি ভাই। তোমার কথা না শুনে ঝকমারি হয়েছে আমাদের।”

আজাহার বলল, “আল্লা কসম। আর কখনও আমরা কারও সঙ্গে লড়াই করতে যাব না। তোমাকে আমরা কথা দিচ্ছি ভাই।”

দু’জনেই তখন আধমরা হয়ে গেছে। কেটে ছিড়ে রক্তও বেরুচ্ছে গা দিয়ে।

এবার বুঝি দয়া হল লোকটির। মার থামিয়ে বলল, “ঠিক বলছিস তো?”

আজাহার বলল, “খোদা কসম।”

“আর কখনও এইসব করতে বেরোবি না?”

“না।”

“তিন সত্যি কর।”

“করলাম।”

লোকটি বলল, “দেখলি তো আমার নামের মহিমা ? আমি আগেই বলেছি যে, আমার সঙ্গে বাঁকা ব্যবহার করলেই আমি বেঁকিয়ে দেব। আমার নাম বাঁকা বাগদি। যাক। এবার কান ধরে দশবার ওঠবোস কর।”

আজাহার, মথুরা তাই করল।

“নাকখত দে।”

আজাহার, মথুরা তাই দিল।

লোকটি এবার ওদের ছেড়ে দিয়ে বলল, “যা ব্যাটারা। খুব বেঁচে গেলি এ-যাত্রা। আজকের মতো গাঁয়ে গিয়ে জিরিয়ে নে। কাল সকালেই পালাবি এখান

থেকে। আর কখনও যদি এর ত্রিসীমানায় দেখি তো একেবারে শেষ করে ফেলব।" এই বলে আবার নিজের মনে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান করল লোকটি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে তখন। আজাহার, মথুরা অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে গ্রামে গিয়ে ঢুকল। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের কাছে গিয়ে ধপাস করে উপুড় হয়ে পড়ল দুজনে।

মাতব্বর ব্যক্তিরা তখন মজলিস করছিল চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে। ওদের ওইভাবে পড়তে দেখেই উঠে এল সব। গ্রামসুদ্ধ লোক হইহই করে ছুটে এল।

সবাই জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী?" গ্রামের প্রধান ভোলা চক্রবর্তী বললেন, "কে মশাই আপনারা ?"

মথুরা অতিকষ্টে বলল, "একটু জল।" সঙ্গে সঙ্গে জল এল। আজাহার, মথুরার চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল সকলে। একজন বলল, "আপনারা কি পালোয়ানপুরের বীর বিখ্যাত আজাহার, মথুরা ? আপনাদের গলায় সোনার চেনে রুপোর মেডেল রয়েছে দেখছি ?"

আজাহার, মথুরা বলল, "হ্যাঁ ভাই। আমরা তারাই।"

"তা এমন দশা কে করল আপনাদের?"

আজাহার, মথুরা তখন সব কথা খুলে বলল ওদের। সব শুনে গ্রামের লোকদের তো বিস্ময়ের অবধি রইল না। এমন যমের মতো চেহারার দু-দু'জন লোককে একা কোনও লোক এইভাবে যে মারতে পারে, তা তাদের ধারণারও বাইরে।

গ্রামবাসীরা বলল, "না মশাই, সেরকম শক্তিমান লোক এ অঞ্চলে নেই। তা ছাড়া এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নাকি? আপনাদের শক্তির কাছে দেশ-

দেশান্তরের লোক নতি স্বীকার করছে। আর আমাদের গ্রামের একজন লোক আপনাদের দুজনকে একা এইভাবে মারবে এ কী করে বিশ্বাস করি বলুন?"

আজাহার বলল, "তা হলে কি বলতে চান আমরা মিথ্যে কথা বলছি? আমাদের দুজনের এই অবস্থা যা আপনারা চোখে দেখছেন এও কি মিথ্যে ?"

"তা হলে আপনাদের শুনতে ভুল হয়েছে। সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রামের লোক।"

মথুরা বলল, "আরে না না। শুনতে আমাদের একটুও ভুল হয়নি। সে নিজের মুখে বলেছে এই গাঁয়ে থাকে সে।"

ভোলা চক্রবর্তী বললেন, "অসম্ভব! এরকম একজন লোক আমাদের গ্রামে থাকবে অথচ আমরা তাকে চিনব না, এ কি একটা কথার মতো কথা ?"

আজাহার বলল, "সে বলেছে এই গাঁয়ের বাগদিপাড়ায় সে থাকে।"

"বেশ তো, শুধু বাগদিপাড়া কেন, এই গ্রামে যত লোক আছে, ছেলে থেকে বুড়ো থেকে সবাইকে এনে হাজির করছি এখানে। কই দেখিয়ে দিন তো সেই লোকটিকে।"

আজাহার এক এক করে দেখল প্রত্যেককে। কিন্তু কোথায় সেই লোক! সেই আসল লোকটিকেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

গ্রামবাসীরা বলল, "দেখলেন তো? বললুম ওরকম লোক নেই কেউ আমাদের গ্রামে। সে নিশ্চয়ই কোনও ভিন গাঁয়ের লোক। কেননা আমরা এই ক'জন ছাড়া আর একটিও বাড়তি লোক নেই এই গাঁয়ে।"

আজাহার বলল, "আশ্চর্য তো! আপনাদের ভেতর সত্যিই তো দেখলুম না সেই লোকটিকে।"

"আরে মশাই থাকলে তো দেখবেন? ওরকম শক্তিমান লোক এ তল্লাটে নেই।"

“কিন্তু সে যে খালি গায়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। নিজে মুখে বলল এই গাঁয়েই সে থাকে।”

“বাজে কথা বলেছে। ওরকম লোক এ গাঁয়ে থাকেই না! ছোটখাটো মস্তান অবশ্য একজন আমাদের গাঁয়েও আছে। সে হল পশ্চিমপাড়ার গোপলা। ওই দেখুন সে বসে আছে ওখানে ।”

আজাহার, মথুরা অবাক হয়ে বলল, “তাই তো! বড় আশ্চর্যের কথা।” ভোলা চক্রবর্তী বললেন, “আচ্ছা, সে কোনও নামটাম বলেছে আপনাদের ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। নাম বলেছে।”

“কী নাম ?”

“বাঁকা বাগদি।”

নামটা শোনামাত্রই সকলে যেন আঁতকে উঠল কীরকম! সবাই সবাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

ভোলা চক্রবর্তী বললেন, “বাঁকা বাগদি। নামটা ঠিক শুনেছেন তো মশাই?”

“শুনেছি মানে? ও নাম আমরা জীবনে ভুলব?”

“এ—এ—এ কী করে সম্ভব!”

“কেন, বাঁকা বাগদিকে আপনারা চেনেন না ?”

“চিনি না মানে? বিলক্ষণ চিনি। সে তো এই গ্রামেরই লোক। গত বছর ঠিক আজকের দিনে, যে বটগাছটার তলায় আপনারা বসে ছিলেন সেই বটগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল সে।”

এই পর্যন্ত শোনামাত্রই আজাহার, মথুরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে আর এক মুহূর্তও সে গ্রামে থাকতে রাজি হয়নি তারা।

বিজলের ডাঙা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

হুগলি জেলার রূপরাজপুরের প্রবোধকৃষ্ণ পাল মহাশয় গল্পটি আমাকে বলেছিলেন। তবে এও বলেছিলেন যে, এই গল্পের সময়সীমা সঠিক করে বলা শক্ত। কেননা বহুদিনের পুরনো ঘটনা এটি। হুগলি বর্ধমান বর্ডারে বর্ধমান জেলার মধ্যে বিজলে নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ একদিন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঝগড়া করে গ্রামের প্রান্তে ধু-ধু মাঠের ধারে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। সংসারে নানা অভাব অভিযোগ। সেই নিয়েই ঝগড়াঝাঁটি। ব্রাহ্মণীর বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে ব্রাহ্মণ তাই আত্মহত্যা করবেন স্থির করে গাছে উঠে সঙ্গে আনা গামছা দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করলেন। তারপর টেনেটুনে দেখে যখন বুঝলেন ছিড়ে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই, তখন শেষবারের মতো একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে গলায় ফাঁস দিতে গেলেন। যেই না ওই কাজ করতে যাবেন, অমনই হল কি, একটা কালো হাত হঠাৎ কোথা থেকে এসে গামছাটাকে টেনে ধরল।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় অন্ধকারে ব্রাহ্মণ দেখতে পেলেন একটা ছায়াশরীর গাছের মোটা ডালে হেলান দিয়ে বসে ফিকফিক করে হাসছে। সেদিকে তাকাতেই ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ব্রাহ্মণের।

ছায়াশরীর বলল, "কী ব্যাপার ঠাকুর! আপনি হঠাৎ আত্মহত্যা করতে এসেছেন যে? আপনি ব্রাহ্মণ। পুরজনের হিতকামনা করবেন, মানুষকে সৎ উপদেশ দেবেন, তার জায়গায় আপনি এসেছেন আত্মহত্যা করতে? এ কাজ কি আপনার সাজে ? ছিঃ ঠাকুর! আপনি কি জানেন না আত্মহত্যা মহাপাপ!"

ব্রাহ্মণ বললেন, "সবই জানি ভাই, সবই বুঝি। কিন্তু সব বুঝেও বড় জ্বালায় জ্বলে এই কাজ করতে এসেছি।"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে এ কাজ করতে দেব না ঠাকুর। ওই কাজ করে আমি এই অবস্থায় যে কত বছর আছি, তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। এর থেকে উদ্ধার নেই। আপনার ছেলে নেই, মেয়ে নেই, শুধু কর্তা আর গিন্নিতে থাকেন। আপনি এ কাজ করতে যাবেন কোন দুঃখে?"

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু তুমি আমার এত খবর রাখলে কী করে ভাই?"

"তার আগে আপনি আমার কথার উত্তর দিন। বলুন, কেন এ কাজ করতে এসেছেন?"

"দুঃখের কথা কী আর বলব ভাই, আমার গিন্নিকে তো তুমি চেনো না! অমন দজ্জাল মেয়েছেলে এই তল্লাটে দুটি নেই। তার জ্বলনে বাড়িতে কাক চিলও বসতে পারে না। তাই এমনই অতিষ্ট হয়ে উঠেছি যে, ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাব বলেই এ কাজ করতে এসেছি আমি।"

ছায়ামূর্তি এক লাফে গাছের ডালের ওপর খাড়া হয়ে বলল, "ওরে বাবা! আপনার গিন্নির কথা আর বলবেন না ঠাকুর। ওরকম মেয়েমানুষ আমি কখনও দেখিনি। ওকে আমিও চিনি হাড়ে হাড়ে। আপনাদের বাড়ির পাশেই যে আমগাছটা আছে, সেই গাছে আমার একশো বছরের বাস। শুধু আপনার গিন্নির চিৎকার চেঁচামেচি আর গালাগালির চোটে আজ বছরখানেক হল আমিই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি এখানে। কাজেই যার গালাগালিতে ভূত পালায়, আপনি মানুষ হয়ে তাকে নিয়ে ঘর কী করে করবেন? তা ঠিক আছে, আপনাকে আত্মহত্যা করতে হবে না। আপনি এইখানেই থাকুন। আমি আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি।"

ব্রাহ্মণ তখন গাছ থেকে নেমে এসে মাটিতে বসলেন। ভূতও নেমে এল। সে এক আশ্চর্য রকমের পরিবেশ। একদিকে ঘন জঙ্গল এবং অপরদিকে ধু-ধু মাঠ।

ব্রাহ্মণ বললেন, "সবই তো বুঝলুম। কিন্তু তুমি যে আমাকে থাকতে বলছ, এই জঙ্গলে আমি থাকব কোথায়? আর যদিও থাকি, খাবটা কী?"

"সে চিন্তা আপনার নয় ঠাকুর। সে চিন্তা আমার। আমি এই গাছতলায় আপনাকে একটি ঝোপড়ি বানিয়ে দেব। আপনি দিব্যি বহাল তবিয়তে সেখানে থাকবেন। আর এই যে দেখছেন ধু-ধু মাঠ, এটা হচ্ছে অনাবাদী পতিত জমি। এই জমির দখল নিয়ে আপনি চাষবাস করুন। এতে যা ফসল ফলবে, তা সবই আপনি ভোগ করে সুখে দিন কাটাতে পারবেন।"

"কিন্তু!"

"এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। আপনার ব্যবস্থা আমি করছি। আপনি একটু বসুন! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বন্ধুবান্ধবেরা এসে পড়বে। আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সবকিছু করব আপনার।"

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন এবং সামনে বসা বন্ধু ভূতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য ভূতেরা দলে-দলে সেখানে এসে হাজির হয়ে ব্রাহ্মণের সব কথা শুনল। তারপর প্রত্যেকেই একমত হয়ে ব্রাহ্মণের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা মেনে নিল। সকলে মিলে অনেক যুক্তিতর্কের পর বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ, তালগাছ থেকে পাতা ইত্যাদি এনে সে রাতের মতো ব্রাহ্মণের থাকার একটা আস্তানা করে দিল।

ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে সেই আস্তানায় আশ্রয় নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলেন। রাত শেষ হতেই বিদায় নিল ভূতেরা। যাওয়ার আগে বনের ভেতর থেকে

নানাবিধ ফলমূল ব্রাহ্মণের জন্য রেখে গেল তারা। ব্রাহ্মণ তো বেজায় খুশি। এইভাবেই যদি জীবনের কটা দিন কেটে যায় তো মন্দ কী ?

বিজলের ডাঙা ভূতের উপদ্রবের জন্য সেকালে কুখ্যাত ছিল খুব। এর আশেপাশের গ্রামের লোকেরা যেমন—পাঁচশিমুল, আসতই, নঁপাড়া, দোগেছে, আবুঝহাটি, গুড়বাড়ি, দশতনপুর, ইটলা, সাপুড়, জরুল প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ভুলেও কেউ ওদিকে যেত না। কাজেই সবাই যখন শুনল ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঝগড়া করে ব্রাহ্মণ বিজলের ডাঙার দিকে চলে গেছে, তখন ধরেই নিল সবাই যে, ভূতেরা আস্ত গিলে খেয়েছে ব্রাহ্মণকে। বিশেষ করে কয়েকজন দুঃসাহসী লোক যখন ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে-করতে এই পথে এসে দূর থেকে অশ্বত্থ গাছের ডালে গামছার ফাঁস ঝুলতে দেখল, তখন ধারণাটাকে একেবারেই সঠিক বলে মেনে নিল। অতএব ব্রাহ্মণ বেঁচে থেকেও সকলের কাছে মৃত প্রতিপন্ন হলেন। কিন্তু তা হলে কী হয়, ব্রাহ্মণীর কবলমুক্ত হয়ে বাহ্মণ দারুণ সুখী। ভূতেরা তাঁর কোনও অভাবই রাখল না।

সারাদিন ব্রাহ্মণ একলা থাকেন। রাত্রিবেলা বন্ধু ভূতেরা সহায় হয়। তাদের দয়ায় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিক হয়ে গেলেন তিনি। একদিন ভূতেরা বলল, "আপনি এক কাজ করুন। এই জমি তো অনাবাদী পড়ে আছে। আপনি একে আবাদ করে ফসল ফলান।" ব্রাহ্মণ বললেন, "বললি তো বেশ! আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ জমি চাষব কী করে? আমি কি চাষের কাজ কিছু জানি ?”

ভূতেরা বলল, হুঁ। এ বড় সমস্যার কথা বটে। তা ঠাকুর, আপনি এক কাজ করুন, রাত্রিবেলা গ্রামের লোক ঘুমিয়ে পড়লে গ্রামবাসীদের ঘর থেকে লুকিয়ে গোটাকতক কোদাল জোগাড় করে নিয়ে আসুন দেখি, বাকি কাজটা আমরাই করে দেব।”

ব্রাহ্মণ তাই করলেন। ভূতের পরামর্শ মতো গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে এর-ওর বাড়ি থেকে কোদাল-কুড়ুল ইত্যাদি যা পেলেন, নিয়ে এলেন।

তাই নিয়ে সারারাত ধরে চলল ভূতের উপদ্রব। সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রাতারাতি মাটি কুপিয়ে ভূতেরা চাষের উপযোগী করে ফেলল। তারপর বলল, "যান, যাদের জিনিস তাদের ফেরত দিয়ে আসুন।"

ব্রাহ্মণ তাই করলেন। আর একদিন ভূতেরা বলল, "ঠাকুর, কয়েকটা বালতি চাই যে! জমিতে জল দিতে হবে।"

ব্রাহ্মণ তখনই গ্রামে গিয়ে বালতি নিয়ে এলেন। এইভাবেই শুরু হল চাষ-আবাদ। দেখতে-দেখতে সবুজ শস্যে খেত ভরে উঠল। মাঠের ধান মাঠে পাকল। ভূত মজুরেই সবকিছু করে। ব্রাহ্মণের গোলাভরা ধান হল। এত ধান যে, আশপাশের গ্রামের লোকের খামারে অত ধান নেই।

সেটা ছিল খরার বছর। চারদিকে অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেল। কত মানুষ না খেতে পেয়ে মরল। অথচ ব্রাহ্মণের গোলাভর্তি ধান। তাই একদিন ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে সন্ধের সময় চুপিচুপি গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। ভাবলেন, ব্রাহ্মণীকে সব কথা বলে ক্ষমা-ঘেন্না করে নিয়ে আসবেন এখানে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল।

ব্রাহ্মণকে রাতের অন্ধকারে দেখামাত্রই ভয়ে চিৎকার করে এমন কান্ড বাঁধালেন ব্রাহ্মণী যে, গ্রাম সুদ্ধু লোক হইহই করে লাঠি-সোটা নিয়ে ছুটে এল। তারপর ব্রাহ্মণকে দেখেই তো চক্ষুস্থির। সবাই তাকে ভূত মনে করে নির্দয় ভাবে লাঠিপেটা করতে লাগল। কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি খেতেই রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়লেন ব্রাহ্মণ। তারপর যখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেলেন, তখনই গ্রামের লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তখন সব শেষ। একমাত্র সৎকার ছাড়া করবার আর কিছুই ছিল না তখন।

অপঘাতে মৃত্যু। তাই তৃতীয় দিনে খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল ব্রাহ্মণের। গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ঢাকতে সব ব্যবস্থা করল। অনেক লোকজনও্ খেল। কিন্তু বন্ধু ভূতেরা ব্রাহ্মণের যে শ্রাদ্ধবাসরের আয়োজন বসিয়েছিলেন সেদিন, তার যেন তুলনাই নেই। গ্রামের লোকেরা বিজলের ডাঙার দিকে না গেলেও দূর থেকেই দেখতে পেল হাঁড়ি ভর্তি মন্ডা-মিঠাই ক্রমাগত আকাশপথে নেমে আসছে বিজলের ডাঙায়। সারারাত ধরে শুধু নামছে তো নামছেই। সে নামারও আর শেষ নেই! যতক্ষণ না ভোর হল, ততক্ষণ এক নাগাড়ে ওইভাবে নামতেই লাগল সব, তারপর থেকে প্রতি বছরই ওই বিশেষ দিনটিতে গ্রামের লোকেরা দেখতে পেত ওই একইভাবে আকাশ থেকে খাবার নেমে আসছে বিজলের ডাঙায়। তবে এখন আর আসে না। আর সেইসব বন্ধু ভূতেরাই বা এখন কে কোথায়, তাই বা কে জানে!

সতে মুচি

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সতে মুচি জাতে মুচি হলেও জুতো সেলাই সে করে না। পেশা তার ঢোল বাজানো। সেজন্য কেউ কেউ বলে সতে বায়েন। সতে কিন্তু তার নামের শেষে বায়েন বলে না, বলে মুচি, সত্যেশ্বর মুচি। এই সত্যেশ্বর মুচি বা সতে মুচিকে নিয়ে আমাদের গ্রামে ভারী মজার একটি গল্প প্রচলিত আছে।

আমাদের গ্রামের অনতিদূরে রায়না নামে এক বিখ্যাত গ্রাম আছে। একদিন সতে এবং ওর দূরসম্পর্কের এক জ্যাঠামশাই ভূষণ কী এক জরুরি কাজে খুব ভোরে রায়না যাওয়া ঠিক করল। আগের দিন রাত্রে সব ঠিকঠাক করে পরদিন ভোরবেলায় ভূষণ এসে সতেকে ডাকল, "সতে!"

তখন নিশিভোর। আকাশ তখনও অন্ধকার একটিও কাকপক্ষী ডাকেনি। তেমন সময় ভূষণ ডাকল, "সতে! এই সতে!"

কিন্তু কোথায় সতে! সাড়া নেই শব্দ নেই। অবশেষে অনেক ডাকাডাকির পর সতের বউ দরজা খুলল।

বলল, "কী ব্যাপার? সতেকে ডেকে দাও। সকাল করে না গেলে কোনও কাজই যে হবে না।"

সতের বউ তো আকাশ থেকে পড়ল। "ওমা! এই তো খানিক আগে আপনি এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন? আবার এখন এসে ডাকাডাকি করছেন, বলি ব্যাপারটা কী?"

ভূষণের তো চক্ষু তখন চড়কগাছ। "আমি এসে ডেকে নিয়ে গেলাম! আমি তো এই আসছি।"

“না। আপনিই তো ডাকলেন তাকে। সেও অমনই আপনার ডাক শুনে বেরিয়ে গেল।” ভূষণ তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, “কী সর্বনাশ!”

“তা হলে কী হবে ? একেবারে আপনার মতো গলায় কে তাকে ডাকল তবে ?”

ভূষণ বলল, “ঠিক বলছ, আমার মতো গলা? না কি অন্য কেউ ডেকেছে?”

“না গো জ্যাঠা, না। অবিকল আপনার মতো গলায় তাকে পাকল। আমার মন বলছে নিশ্চয় কোনও অমঙ্গল হয়েছে তার। আপনি এ আমি এক্ষুনি খোঁজখবর নিন। আমি মেয়েমানুষ, আমি কোথায় কি করব?”

ভূষণ বলল, “বড় আশ্চর্য ব্যাপার বটে। নিশিভোরে অবিকল আমার মতো গলা করে ভাকল। সেও অমনই বেরিয়ে গেল। এ তো দেখছি অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার। ঠিক আছে, তুমি কিছুটি ভেবো না। আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।”

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জড়ো করে ফেলল ভূষণ।

দেখতে দেখতে সকালও হয়ে গেল। তারপর শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা। গাঁয়ের সর্বত্র তন্নতন্ন করে খোঁজা হল সতেকে। দুজন রায়না গেল। দু’জন খণ্ডঘোষে তার শ্বশুরবাড়িতে গেল। দুজন গেল জাহানাবাদ। কিন্তু কোথায় সতে? শুধু শুধু খোঁজাখুঁজিই সার হল।

সতের বউ তখন কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

ভূষণ বলল, “কী বিপদ! খুঁজে পাওয়া গেল না বলে হাল ছেড়ে দিলে কী করে হবে? আবার খোঁজো। যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করো তাকে।”

আবার শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা। বনজঙ্গল তোলপাড় করা হল। কিন্তু তবুও কোনওখানে সতের এতটুকু চিহ্নও পাওয়া গেল না।

ভূষণ বলল, “পুকুরে জাল ফেলে দেখো। যদি কেউ কোনও অপকর্ম করে ডুবিয়ে রেখে থাকে তাকে !”

জাল নামল পুকুরে। সতে সেখানেও নেই। কাজেই বাধ্য হয়েই হাল ছেড়ে দিতে হল। নিশিভোরে একজন জলজ্যান্ত মানুষ বেমালুম উবে গেল গ্রামের বুক থেকে, এই সংবাদটাই শুধু বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন, দুদিন, তিনদিন। চারদিনের দিন ভূষণ ওর মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। তখন চৈত্রের শেষ। দুপুরবেলা। খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর। একটা ছাতি মাথায় খালি পায়ে সতের কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল ভূষণ। গাঁয়ের প্রান্তে বাবুরমায়ের খালের ওপারে মালগোড়ে বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে বিরাট এক বটগাছের নীচে গিয়ে ভূষণ বসল। এই পথে কতদিন সতেকে সঙ্গে নিয়ে ভূষণ তার মেয়ের বাড়ি গেছে। এই গাছতলায় কতবার বিশ্রাম করতে বসে দু'জনে কত গল্প করেছে। সেইসব কথা ভাবতে লাগল ভূষণ। ভাবতে ভাবতে সতের জন্য মনটা তার আরও বেশি খারাপ হয়ে গেল। কী যে হল মানুষটার। বেমালুম উবে গেল। গায়ের লোকে কত কথাই না বলছে এসব ব্যাপার নিয়ে। কেউ বলছে, ওকে ঠিক নিশিতে ডেকেছে। কেউ বলছে, বাঘে খেয়েছে। কেউ বলছে, দেশত্যাগ করেছে। যার যা ইচ্ছে সে তাই বলছে। দুষ্ট লোকেরা বলছে, ওসব ভূষণেরই কারসাজি। সে-ই নিশ্চয়ই কোনও কিছুর লোভে সরিয়েছে সতেকে। শেষের কথাটা শুনলে কেমন যেন ছাৎ করে ওঠে বুকের ভেতরটা। কিন্তু মানুষের মুখে তো হাতচাপা দেওয়া যাবে না। কাজেই যে যা বলে তা চোখ কান বুজে শুনে যেতে হয়।

ভূষণ যখন গাছতলায় বসে বসে এইসব ভাবছে সেই সময় হঠাৎ ওর পায়ের ওপর জলের মতো এক ফোঁটা কী যেন পড়ল টস করে। ভূষণ ভাবল এ নিশ্চয়ই কাকপক্ষীদের কাজ। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন আর এক ফোঁটা পড়ল তখন আর সন্দেহভঞ্জন না করে পারল না। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য ওপরদিকে তাকাতেই মাথাটা গেল ঘুরে। যা সে দেখতে পেল তা স্বচক্ষে দেখেও

যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ভূষণ দেখতে পেল সেই বটগাছের অতি উচ্চে তিনটি মোটা মোটা ডালের ফাঁকে চুপচাপ শুয়ে আছে সতে। আর তারই কাতর দুটি চোখ বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে সেই জলের ফোঁটা।

সতেকে দেখতে পেয়েই ভূষণ লাফিয়ে উঠল, "সতে! এই সতে!" কিন্তু কে দেবে সাড়া? সাড়া নেই শব্দ নেই। সতে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। ভূষণ আবার ডাকল, "সতে রে!"

সতে এবারও সাড়া দিল না।

ভূষণ ফের ডাকল, "এই! এই সতে! ওখানে শুয়ে আছিস কেন? আমি জ্যাঠামশাই। আমাকে চিনতে পারছিস না ?"

সতে নিরুত্তর।

ভূষণ বুঝল গতিক সুবিধের নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ভৌতিক ব্যাপার রয়েছে। নয়তো মাথাখারাপ হয়েছে সতের। কিন্তু ভৌতিক ব্যাপারই যদি হয় তা হলে তো একে এখানে একা ফেলে রেখে কাউকে ডাকতে যাওয়া ঠিক হবে না। ততক্ষণে মাল পাচার হয়ে যাবে। তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজে মরে গেলেও আর কোথাও পাওয়া যাবে না তাকে। অথচ ওকে ওখান থেকে নামিয়ে আনাও তার একার কর্ম নয়।

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সেখান দিয়ে ভূষণেরই এক চেনা লোক যাচ্ছিল। ভূষণ তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বলে গাছতলায় নিয়ে এল তাকে। তারপর সতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই। ওই দ্যাখো।"

ওপরদিকে তাকাতেই লোকটির তো চক্ষুস্থির, "আরে! সত্যিই তো। ওই তো আমাদের সতে মুচি।"

"ওকে ওখান থেকে এক্ষুনি নামিয়ে ফেলতে হবে।"

"তা তো হবে। কিন্তু ও এখানে এল কী করে?"

"সেইটেই তো আশ্চর্য!"

"আমার মনে হয়, এ নিশ্চয়ই সেই তেনাদের কাজ। যখন-তখন যাদের নাম করতে নেই। ঠিক আছে। তুমি এক কাজ করো। গাছের ওপর উঠে সতেকে একটু ছুয়ে থাকে। আমি ততক্ষণে লোকজন সব ডেকেডুকে আনছি। নাহলে ওকে ওখান থেকে টেনে নামানো তোমার-আমার কর্ম নয়।" এই বলে লোকটি দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলে গেল।

আর ভূষণও তৎক্ষণাৎ গাছে উঠে ছুয়ে ফেলল সতেকে। তারপর লোকজন এলে সবাই মিলে ধরাধরি করে সতেকে নামানো হল। পালকিতে শুইয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। রোজা এসে ঝাড়ফুক করতে অনেকটা সুস্থ হল বেচারা।

দিনকতক পরে যখন সে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠল তখন একদিন সকলের কাছে সব কিছু সবিস্তারে খুলে বলল সে। সতে বলল, সেদিন ভোরবেলায় ভূষণের মতো গলা করে কে যেন তাকে ডাকল। আর সেও অমনই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেরিয়ে এল সেই ডাক শুনে। কিন্তু বাইরে এসে কাউকেই সে দেখতে পেল না। তখন কেমন যেন সর্বশরীর ছমছমিয়ে উঠল তার। এমন সময় হঠাৎ সে বুঝতে পারল তার পায়ের তলা থেকে মাটি ক্রমশ যেন সরে সরে যাচ্ছে এবং অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছে সে। তখন সে কতবার চেষ্টা করল চিৎকার করে কাউকে ডাকবার। কিন্তু তার গলা দিয়ে তখন এতটুকু শব্দ আর বের হল না। কেমন যেন বোবা হয়ে গেল সে। তারপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে খালের ধারে ওই বটগাছের ডালে গিয়ে আটকে গেল। সেই থেকে তিন-চারটে দিন ওইখানেই ওই গাছের ডালেই একভাবে কেটে গেছে তার। ওই গাছের তলা দিয়ে কত লোকজনকে সে যেতে-আসতে দেখেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বের করেও কাউকে সে ডাকতে পারেনি। সারাটা দিন যে কীভাবে কাটত তার, তা একমাত্র সে-ই জানে। সন্ধের পর সে দেখতে পেত

কিম্ভূতকিমাকার দুটো মুখ ভাঁটার মতো চোখ বের করে এগিয়ে আসত তার দিকে। আর সারারাত ধরে তারা লকলকে জিভ বের করে অবিরাম তাকে চাটত। চেটে চেটে তার শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে খেত তারা। তারপর ভোর হলেই আবার ওকে ফেলে রেখে চলে যেত। সারাদিনে আর আসত না। সেই সন্ধের পরে আবার আসত।

সতের মুখে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে।

চপের ভেতর ভূত
উল্লাস মল্লিক

চপের ভেতর ভূত'—গল্পটা লিখে নিজেরই গা ছমছম করতে লাগল সাহিত্যিক করালীচরণের। করালীচরণ সাহসী মানুষ। রাতবিরেতে যাত্রা দেখে একা ফেরেন, অমাবস্যার রাতে নির্জন শ্মশানে যেতে বুক কঁপে না, মাঝে মাঝে নিশুতি রাতে ডাকাতে কালীতলায় গিয়ে গল্পের প্লট ভাবেন।
কিন্তু এখানে ভূতের যে বর্ণনাটা তিনি দিয়েছেন তা বড় সাংঘাতিক। আলকাতরার মতো গাত্রবর্ণ, মোটর গাড়ির হেডলাইটের মতো তীব্র দুটো চোখ, গায়ে সজারুর মতো খোঁচা খোঁচা কাটা। পরনে রক্তাম্বর, গলায় রদ্রাক্ষের মালা। রুদ্রাক্ষের মালাটা দেওয়া ঠিক হল কিনা বুঝে উঠতে পারছেন না। জিনিসটা কাপালিকরা পরে। তবে ভূতেরা পরবে না, এমন কথা নেই। ভাবলেন, আপাতত থাক, পরে না হয় এর ওপর একটা মুন্ডুমালা দিয়ে দেবেন।

করালী যে খুব রোগা-পাতলা মানুষ তাও নয়। পেটানো চেহারা, গা-ভর্তি গুলি গুলি মাসল, বাজখাই গলা। দু'ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। একশো বিঘে ধানি জমি, পনেরো-বিশ বিঘে সবজি বাগান, মাছ কিলবিলে পুকুর পাঁচসাতটা। অভাব বলতে কিছু নেই। কিন্তু করালীচরণের দুঃখটা অন্য জায়গায়। করালী লেখক। আর পাঁচটা হেজি-পেজি লেখকের মতো তিনি চোর, ডাকাত, গোয়েন্দা বা পরিদের গল্প লেখেন না। তার একমাত্র বিষয় 'ভূত'। ভূতের গল্পে তিনি স্পেশালিস্ট। নয় নয় করেও অদ্যবধি শ'খানেক গল্প লিখে ফেলেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা ছাপা হয়নি একটাও। পত্রিকা সম্পাদকেরা আর ভূতের গল্প

ছাপতে চাইছে না। তাদের এক কথা, ভূতেদের দিনকাল গেছে। চারদিকে এত পিলপিলে লোক, জোরালো বৈদ্যুতিক আলো, লোকের আর ভূতে বিশ্বাস নেই।

তবে তিনি সবচাইতে আঘাত পেলেন কিছুদিন আগে। 'অশরীরী' নামে একটা পত্রিকা আছে যারা কিনা শুধুই ভূতের গল্প ছাপে। অনেক আশা নিয়ে একখানা জোরালো গল্প পাঠিয়েছিলেন সেখানে। সম্পাদক ভূতেশ নন্দী কথা দিয়েছিলেন গল্পটা ছাপা হচ্ছে। আনন্দের চোটে করালী পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে রাষ্ট্রও করেছিলেন খবরটা। ক'দিন আগে পত্রিকা দফতর থেকে হঠাৎ তার কাছে একটা চিঠি আসে। দুঃখ-টুঃখ প্রকাশ করে অশরীরী সম্পাদক যা লিখেছেন তার মর্মার্থ এই যে, করালীবাবুর গল্পটা প্রেসে চলে গিয়েছিল; এমন সময় এক নবীন গল্পকার একটি গল্প নিয়ে আসে। সেটি এতই ভয়ঙ্কর যে স্বয়ং সম্পাদক পড়তে পড়তে চেয়ারে বসেই অজ্ঞান হয়ে যান। সুতরাং, সেই গল্প না ছেপে উপায় নেই। করালীচরণের গল্পটা তিনি পরে কোনওদিন ছেপে দেবার চেষ্টা করবেন; করালীবাবুর যেন কিছু মনে না করে—ইত্যাদি। পুনশ্চ দিয়ে সম্পাদক আরও লিখেছেন, প্রেসের কম্পোজার আর প্রুফ রিডারও নাকি গল্পটি পড়াকালীন জ্ঞান হারায়।

সন্ধে হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মেয়ে নিশাচরী বাটি ভর্তি করে ফুরফুরে মুড়ি দিয়ে গেল করালীচরণকে। নৈবিদ্যির মাথায় সন্দেশের মতো, মুড়ির ওপর বড়সড় একটা চপ। দেখেই বোঝা যায় গরম, মনমাতানো গন্ধ পেলেন করালী। মনটা তার বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

এক গাল মুড়ি মুখে পুরে চপে একটা কামড় দিলেন করালীচরণ। আবেশে চোখদুটো বুজে এল। হঠাৎই চপটা হাত থেকে পিছলে বাটিতে পড়ে গেল। করালীচরণ তুলতে যাবেন, অমনি কে যেন বলে উঠল, ওহ্, বাঁ পা-টা একদম জখম করে দিলেন যে।'

বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠল করালীচরণের। এদিক-ওদিক তাকালেন; কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না; ভাবলেন, মনের ভুল। চপটা ফের তুলতে যাবেন, ফের কে যেন বলে উঠল, ‘দেখেছেন, আপনার সামনের দাঁতগুলো একেবারে দগদগে হয়ে বসে গেছে...।”

একটু কাঁপা গলায় করালীচরণ বললেন, কি-কে! আশ্চর্য তো, আজ সারাটাদিন আমায় নিয়ে পড়ে আছেন, আর আমাকেই চিনতে পারলেন না। নিবাস আমার চপের ভেতর।’

করালীচরণের বুকের মধ্যে কে-যেন ভুটভুটি ভ্যান চালিয়ে দিয়েছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনওরকমে বললেন, তাই নাকি? চপের ভেতর থেকে ভেসে এল,—তা শান্তিতে একটু থাকব, জো কী! চপ তো আমিও ভালোবাসতুম, কিন্তু এত নোলা ছিল না। হাতে পেলেই আপনারা সব এত বড়বড় কামড় বসান, সরে বসার টাইম পর্যন্ত পাই না...।”

একটু সামলে নিয়ে করালী বললেন, তা এত জায়গা থাকতে অমন বেয়াড়া জায়গায় ঠিকানা নিলে কেন ?”

আমার দুঃখের কথা কী আর শুনবেন! গেল জন্মে সূক্ষ্ম দেহ পেয়েছিলুম। তা সূক্ষ্ম দেহ পেলেও বাসের তো একটা পাকাপোক্ত ঠেক চাই; এদিকে আবার নিরিবিলি জায়গার বড় অভাব; গাছপালা তো আপনারা সব মেরে কেটে সাফ করে দিলেন, হানাবাড়ি যেগুলো ছিল প্রোমোটার সব ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেছে। তো হল কী, যেদিন জায়গার বিলিব্যবস্থা সেদিন আমার পৌছুতে একটু দেরি হয়ে গেল। যাবার পথে দেখি শিবু ময়রা চপ ভাজছে, লোভে পড়ে দু'খানা সরিয়ে খেয়ে ফেললুম। গিয়ে দেখি শাওড়া, তাল, বেল, নিম সব ভালো ভালো গাছ আগেই বিলি হয়ে গেছে। যে বুড়ো জায়গা বিলিবন্টন করছিল সে মানুষজন্মে মিলিটারি ছিল, পাকিস্তান বর্ডারে গুলি খেয়ে মরেছে। তা মিলিটারিম্যান যেমন হয়, খুব কড়া, ভীষণ রাগি, লেট একদম দেখতে পারে না। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল, চিপে যখন এতই নোলা, তখন চপেই থাক! সেই থেকে বড় কষ্টে আছি দাদা।'

করালীচরণ বুঝলেন, এ ব্যাটা ভূত হলেও নিরীহ গোছের। বুকে একটু বল পেলেন। বললেন, তা চপে থাকতে অসুবিধে কী, বেশ তো জায়গা...।”

বলেন কী! সমস্যা কি একটা ? একে তো ঘুপসি জায়গা, হাত-পা গুটিয়ে থাকতে হয়। তারপর যেটাতে থাকি, বিক্করি হয়ে গেলে অন্য চপে গিয়ে ঢোকো আবার। আপনি তো মনগড়া বর্ণনা দিয়েই খালাস। রং আমার কালো নয় মোটেও; শ্যামবর্ণ ছিলুম, ভাজা হতে হতে ফ্যাকাসে মেরে গেছি। চোখ জ্বালা তো দূরের কথা, ছানির জন্যে ভালো দেখতেই পাই না। গায়ে কিছু লোম ছিল বটে, সেসব এখন নেতিয়ে সুতো; আর আপনি লিখে দিলেন আমার গায়ে সজারুর মতো কাঁটা। লেখকদের বাস্তবজ্ঞানের বড় অভাব।'

করালীচরণ বললেন, 'এঃ হেঃ, তুমি এত বেচারি জীব সত্যি জানতুম না ভাই।'

'বেচারি বলে বেচারি! কত সমস্যা। মানুষের চপে বড্ড নোলা। তন্দ্রা এসেছে, একটু ঝিমুচ্ছি, অমনি কেউ একজন দিল পেল্লায় কামড়। হাত-পা একেবারে জখম। এই তো সেদিন, এক বুড়ো, নাতিকে ভাগ দিতে হবে বলে, চপটা গোটাগুটি মুখে ঢুকিয়ে দিল। আমার তো প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। ভাগ্যিস বুড়োর বা-ধারের কষের দুটো দাঁত ফোকলা ছিল, আমি কোনওরকমে সুড়ৎ করে গলে বাইরে আসি। এখনও গা-গতর টাটিয়ে বিষ।

করালীচরণ খুব দুঃখ-দুঃখ গলায় বললেন, আহা রে!'

খুব কাতর স্বরে চপ-ভূত বলল, আপনার কাছে একটা আর্জি আছে লেখকমশাই।'

করালীচরণ একটু সতর্ক গলায় বললেন, কী? আপনার পুকুরের পশ্চিমপাড়ের যে বুড়ো তালগাছটা কাটার কথা ভাবছেন, আমি বলি কী, ওটা থাক। সামান্য একটা গাছ বেঁচে আপনি আর ক'পয়সা পাবেন! ভাবছি আমি, ওটাতে আস্তানা গাড়ব, বেশ নিরিবিলি শান্তির জায়গা।'

করালীচরণের মাথায় ধা-করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললেন, ঠিক আছে; তালগাছ কাটব না; আমার কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'বলেন, বলেন?'

'এই গল্পটা একটা পত্রিকায় পাঠাচ্ছি। সম্পাদককে ভয় দেখিয়ে, বা যে করেই হোক ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

"এ আর এমন কী কথা; হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিত থাকুন।

'ঠিক তো!'

‘একদম ঠিক, একশোবার ঠিক! আজ আসি, আপনি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন ওটা...।”

করালীচরণ দেখলেন একটা মৃদু বাতাস টেবিলের কাগজপত্রকে একটু কাঁপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু মনে একটা খটকাও থেকে গেল। বড্ড নিরীহ গোছের চেহারা। সম্পাদক ভয় পেলে হয়!

ভাবতে ভাবতে আধখাওয়া ঠান্ডা চপে সাবধানে ছোট্ট একটা কামড় বসালেন সাহিত্যেক করালীচরণ।

বালিডাঙার মাঠ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মির্জানগরের মাঠ পেরিয়ে কানানদী পার হয়ে কিছুটা পথ গেলেই ডান দিকে যে পুকুরটা পড়বে সেই পুকুরকে এ অঞ্চলের লোক এড়িয়ে চলে। কেননা, ভয়ঙ্কর পুকুর সেটা। সুরুকখানার পুকুর। পুকুরের চারপাশে ঘন বাঁশবন। গভীর কালো জল। পুকুর-ভর্তি মাছ। কিন্তু ধরে না কেউ। এমনও প্রবাদ আছে, এই পুকুর থেকে নাকি মাছরাঙায় মাছ নেয় না। সাপেও ব্যাঙ ধরে না। অথচ মেছো পুকুর। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু লোক বা যাযাবর বেদেনিরা দু-একবার চেষ্টা করেছিল এই পুকুরের পাশে বসবাস করে এর বদনাম ঘোচাতে। কিন্তু পারেনি। একরাত যে থেকেছে সে-ই বলেছে বাপরে বাপ'।

তা এই পুকুরকে নিয়ে কিন্তু আজকের এই গল্প নয়। বর্ধমানের মুছখানা মথুরাপুর থেকে হরিহর যাচ্ছিল ওর বোনের বাড়ি। অনেকদিন কোনও খবরাখবর না পেয়ে মনে মনে খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎই একজনের মুখে শুনতে পেল ওর বোনের নাকি খুব অসুখ। তাই আর একটুও দেরি না করে সে গামছায় দুটি মুড়ি বেঁধে রওনা হল বোনের বাড়ির দিকে।

হরিহর যে পথে যাচ্ছিল সেই পথেই এই সুরুকখানা এবং বালিডাঙার মাঠ। তা এই দুটো জায়গাই ছিল খুব খারাপ। এখন বালিডাঙার মাঠ পার হতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি ওর বোনের বাড়ি পৌছনো যায়। আর এই মাঠকে ত্যাগ করলে বা অন্য পথে ঘুরে গেলে তিন-চার মাইল পথ হাটা তো বেশিই হয় উপরন্তু বোনের বাড়ি পৌঁছতে রাতও হয়ে যায় খুব। তাই হরিহর মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে জেনেশুনেই এই বালিডাঙার মাঠে নামল।

ভূতের উপদ্রবের জন্য এ-মাঠে চাষও হয় না বলতে গেলে। আর লোকজনও থাকে না। হরিহর মাঠে নেমে দেখল, ধু-ধু করছে মাঠ। দিগন্তবিস্তৃত। চৈত্রের রোদ্দুরে লি-লি করছে যেন। এই দিনের আলোয় তাই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। একবার জয়দুর্গা বলে কোনওরকমে মাঠটা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্তি। রাতভিত হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। এখন এখানে ভয় কী? ভূতেরা আর যাই করুক দিনের বেলায় তো ভয় দেখাবে না। আর সত্যিই যদি ভয় দেখায় তো ভূত কী জিনিস তা স্বচক্ষে দেখাই যাবে। কেননা, ভূত আছে শুনেছে। অন্ধকারে পুকুরপাড়ে বনে-বাদাড়ে ভূতের ভয়ে গা ছমছম করে, তাও জানে। কিন্তু ভূত ও নিজে কখনও দেখেনি, বা কেউ দেখেছে বলে শোনেনি। তা এই বালিডাঙার মাঠে এসে সত্যি-সত্যিই যদি ভূত দেখা যায় তো মন্দ কী?

হরিহর আপন মনেই এগিয়ে চলেছে। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, মনটাও ওর ভাল নেই। বহু কষ্ট করে বোনটার বিয়ে দিয়েছে ও। অথচ এই এক বছরের মধ্যে ওর এমন একটা অসুখের কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকের চেয়েও একটু দ্রুত পা চালিয়ে ও মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলতে লাগল।

বেশ খানিকটা গেছে এমন সময় হঠাৎই মনে হল কে যেন ওর পেছন-পেছন আসছে। হরিহর একবার তাকিয়ে দেখল। কই, কেউ তো নেই। আবার চলা শুরু করল। আবার ওই একই রকম মনে হল। ভারী মজার ব্যাপার তো!

এমন সময় হঠাৎ ওর সামনে কে যেন একজন পথরোধ করে দাঁড়াল। দেখল কাস্তে হাতে এক কৃষাণ। মাথায় গামছার ফেটি বাঁধা। কৃষাণটি গম্ভীর গলায় বলল, "ওহে ও ছোকরা, বলি এই ভরদুপুরে বালিডাঙার মাঠ পার হয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

হরিহর বলল, "আমার বোনের খুব অসুখ। তাই দেখতে যাচ্ছি।"

"কেন, আর কোনও পথ ছিল না ?"

"সে-পথে গেলে রাত্রি হয়ে যাবে, তাই এই পথে যাচ্ছি। খুব বাড়াবাড়ি অসুখ কিনা।"

"বাড়াবাড়ি না ছাই। বুকে সর্দি বসে জ্বর হয়েছিল। এখন সেরে গেছে। ভালই আছে এখন। তুমি আর এগিও না। যেমন এসেছ তেমনই ফিরে যাও। হয় ঘুরে যাও, নয়তো ঘরে যাও।"

"তা কী করে হয় ভাই?"

"যা বলছি শোনো। আর এগিও না। আমাদের সভা চলছে এখন। গেলে অসুবিধে হবে।

হরিহর বলল, "খবর ভাল হোক মন্দ হোক, এত পথ কষ্ট করে এসেছি যখন, ফিরে তো যাব না। আবার কাল কে আসে? যা হয় হবে। আমি যাবই।"

কৃষাণ বলল, "আমার কথা তা হলে শুনবে না তুমি?"

হরিহর ওর কথার উত্তর না দিয়েই এগিয়ে চলল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ ওর শরীরে কীরকম যেন একটা শিহরন খেলে গেল। ও দেখল একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে কতকগুলো কায়াহীন ছায়া গোল হয়ে বসে আছে। আর তাদের মাঝখানে বসে আছে গলায় হাড়ের মালা পরা আর-এক ছায়ামূর্তি। এই কি তবে ভূতের রাজ্য? আর এরা সবাই ভূত ? ভূত ছাড়া এরা আর কীই-বা হতে পারে? কারও কোনও শরীর নেই। শুধু ছায়াগুলো রয়েছে।

হরিহর যেতেই ওদের সভার কাজ থেমে গেল।

সবাই চুপচাপ।

ভূতের রাজা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরিহরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে তুই! এমন আচমকা এসে পড়ে আমাদের সভার কাজ পন্ডু করলি কেন?"

হরিহর দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমি নিরুপায় হয়ে এই পথে এসে পড়েছি। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের কোনও ক্ষতি করিনি। আমি তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমার কোনও লোক তোকে এ-পথে আসতে বারণ করেনি?"

"করেছিল। তবে সে যে আপনার লোক তা অবশ্য আমি জানতাম না।"

"সে আমারই লোক।"

ভূতের রাজা হরিহরকে আর কিছু বলল না, শুধু হাত নেড়ে দলের লোকেদের ইশারা করতেই সবাই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইল শুধু হরিহর বুঝল কাজটা সে সত্যিই ভাল করেনি।

হরিহরের একবার ভয় হল। আবার ভয়কে জয়ও করল সে। জীবনে এই প্রথম ভূত দেখল ও। তাও দিনদুপুরে। এ গল্প ও করবে কার কাছে? যাকে বলতে যাবে সেই তো হাসবে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক হরিহর নিজে তো করেছে। হ্যাঁ, ভূত আছে। সত্যিই আছে। এবং সে ভূত জনশ্রুতির নয়, বাস্তবের। কেননা, সে নিজের চেয়ে ভূত দেখেছে।

যাই হোক, সন্ধের আগেই সে বোনের বাড়িতে পৌঁছল। হরিহরের মুখে সব কথা শুনে ওর বোনের শ্বশুর এবং অন্যান্য লোকেরা সবাই খুব বকবক করল ওকে। সবই বলল "কাজটা খুব ভাল করোনি হরিহর যে-পথে কেউ আসে না সে-পথে এই ভরদুপুরে কেন তুমি এলে? তাও এলেই যখন, ওই কৃষাণের নিষেধ তুমি উপেক্ষা করলে কেন? এখন যদি তুমি ওদের কোপদৃষ্টিতে পড়ো, তোমাকে রক্ষা করবে কে?"

হরিহরের বোন বলল, "তা ছাড়া আমার সত্যি-সত্যিই কোনও ভারী অসুখ হয়নি দাদা। সামান্য একটু জ্বরই হয়েছিল। বুকে সর্দি বসে জ্বর। কয়েকটা ইনজেকশন নিতেই সের গেছে। এদিকে অনেকদিন তুমি আসোনি বলে তোমার

কোনও খবর-টবর না পেয়ে মনে দুঃখ হয়েছিল খুব। দারুণ অভিমান হয়েছিল। তাই আমাদের গ্রামের একজন লোক তোমাদের ওদিকে গেলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিল, বউমা, তোমার বাপের বাড়িতে কোনও খবর দিতে হবে? তা আমি বলেছিলাম, না। কোনও খবরই দিতে হবে না। তবে দাদার সঙ্গে যদি দেখা হয়, কিছু যদি জিজ্ঞেস করে তখন বোলো যে, তোমার বোন মরতে বসেছে। তুমি সেই কথা শুনেই ছুটে এসেছ দাদা। কিন্তু এটা তুমি কী করলে?"

যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। কাজেই আর ভেবেচিন্তে কোনও লাভ নেই। এখন ভালই-ভালই ও পথ ত্যাগ করে অন্য পথে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়! কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে সেই রাতেই হরিহর দু-একবার রক্তবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ল। শুধু কি রক্তবমি? সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর আর ভুল বকা।

পরদিন সকালেই হরিহরের ইচ্ছেমতো ওর বোনের বাড়ির লোকেরা হরিহরকে গোরুর গাড়িতে শুইয়ে তার গ্রামে পাঠিয়ে দিল।

বালিডাঙা থেকে অত শরীর খারাপ নিয়ে মথুরাপুরে ফিরে এল বটে হরিহর, তবে কিনা কাজের কাজ কিছুই হল না। যত দিন যেতে লাগল ততই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল ওর। বহু ডাক্তার বাদ্য ওঝাপত্তর করল। কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হল না। হাজার রকমের তুকতাক, জলপড়া, ঝাড়ফুক, সবই বৃথা হল।

অবশেষে এক সত্যিকারের গুনিনের সন্ধান পেল ওর বাড়ির লোকেরা।

গুনিনকে সন্তুষ্ট করে ডেকে আনতেই সব দেখেশুনে গুনিন বললেন, "হ্যাঁ। আমি পারব এ ভূত ছড়াতে। এ বড় জাঁদরেল ভূত। খুব রেগে গিয়ে ধরে আছে ওকে।"

তা গুনিনের ঝাড়ফুঁকে সত্যিই কাজ হল। দু-চারবার সরষে চোঁয়া মারতেই আর প্যাকাটির ফুঁ দিতেই "বাবা রে, মা রে" করে ভূত হরিহরকে ছেড়ে পালাতে পথ পেল না!

কিন্তু মুশকিল হল এই, গুনিন আসেন, ঝাড়ফুঁক করেন, ভূতও পালায়। কিন্তু যেই গুনিন বাড়ি ফেরেন, ভূত এসে আকার ধরে।

বারবার যখন এইরকম হতে থাকে রোগীর বাড়ির লোকেরা তখন আবার ধরেন গুনিনকে। বলে,"বাঁচান মশাই। মরে গেলুম। আর তো পারি না। আপনি গেলেই রোগী সুস্থ হয়। আর আপনি খালপার হলেই আবার ধরে রোগীকে।"

তা সেদিন গুনিন নিবারণ হালদারমশাই খুবই রেগে বললেন,"আজই তা হলে ও ব্যাটার শেষদিন হোক। ওর জন্য আমার কেন বদনাম হয়। তা ঠিক আছে, তোমরা যাও। আজ গিয়ে আমি এমন ওষুধ দেব যে, আর ওর ধারেকাছে কোনও ভূত কখনও আসতে সাহস করবে না। ও ভূত তো কোন ছার।" এই বলে হালদারমশাই তাঁর শেষ দাওয়াই ব্রহ্মকবচ হাতে নিয়ে রওনা হলেন রোগীর বাড়ির দিকে।

গ্রামসুদ্ধ লোক গুনিনের কেরামতি দেখবার জন্য হাঁ করে বসে ছিল। গুনিন যেতেই হইহই করে উঠল সকলে।

হালদারমশাই বললেন, "না, আজ আর আমি কোনওরকম ঝাড়ফুঁক করব না। একটা রক্ষাকবচ পরিয়ে দেব শুধু তারপর দেখব কোন ভূতে কী করে ওকে ধরে।"

গুনিনকে দেখেই ভূত পালাল।

সুস্থ লোকটির গলায় কবচ বেঁধে গুনিন বললেন, "এই তোমার রক্ষাকবচ বাবা। খুব যত্নে রেখো এটা। অন্তত বছরখানেক। আর তোমাকে ভূতে ধরবে না।"

হরিহর হালদারমশাইকে প্রণাম করল। এবং সত্যি-সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। অর্থাৎ, সেদিন গুনিন চলে যাওয়ার পরেও আর তাকে কোনও ভূতেই ধরল না।

এই ব্যাপারে ওঝা হিসেবে নিবারণ হালদারের ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। পড়বে নাই বা কেন? এমন বেয়াড়া ব্যাপার তো হামেশা ঘটে না। তা কে কবেই বা এসব দেখেছে। ওইরকম একটা ঢাটা-ভূতকে জব্দ করা কি চাট্টিখানি কথা? হালদারমশাইও তাই বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চারদিকে।

পরদিন সন্ধেবেলা ফাঁকা মাঠে একা পেয়ে ভূতেরা এসে ধরল হালদারমশাইকে। বলল, "হালদার, তুই মস্ত গুনিন। গুনিনের সেরা গুনিন। কিন্তু আমাদের পেছনে লেগে তুই খুব একটা ভাল করলি না। এখনও বলছি আমাদের শিকার আমাদের হাতে তুলে দে।"

হালদার বললেন, "থাম ব্যাটারা। আমি নিবারণ হালদার। আমার সঙ্গে লাগতে আসিস না। আর ওকে তোদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে এই যে দেশময় ধন্যি-ধন্য পড়ে গেছে আমার নামে, সব তা হলে বৃথা হয়ে যাবে। তোরা অন্য কাউকে ধর। আমি তাকে ছাড়াব না।"

"হরিহর আমাদের শিকার। আমরা খুব রেগে আছি ওর ওপর। কাজেই ওকে ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।"

"তা আমার কী ? হরিহরকে ভাল করে আমার দেশজোড়া খ্যাতি। এ সুনাম আমিও হারাতে চাই না।"

ভূতেরা বলল, "আমাদের কথা তুই শুনবি না তা হলে?"

"না।"

"ঠিক আছে। আমরাও এর বদলা নেব। তোর একটিমাত্র ছেলে তো? আনাচে-কানাচে যেখানে-সেখানে ঘোরে। আমরা তার গলা টিপে মারব। তবে তোকে আমরা আর একবার ভেবে দেখার সময় দিলাম।"

"তোদের যা ইচ্ছে কর।"

"তা তো করব। কিন্তু এখনও বলছি হালদার, ওই কবচ তুই খুলে নিয়ে আয়।"

"সম্ভব নয়।"

"তা হলে ধরলাম তোর ছেলেকে। তোর ছেলে এখন পুকুরপাড়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। ধরলাম ওকে। এখনই বেশি ক্ষতি করব না। তবে ঘাড়টা একটু ব্যথা করে দেব।" বলে একটু নীরবতার পর আবার বলল, "তোর ছেলের মুখ দিয়ে এখন রক্ত উঠছে হালদার। তাড়াতাড়ি যা। তবে তুই যাওয়ার আগেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব।" এই কথা বলেই ভূতেরা বেপাত্তা।

আর নিবারণ হালদারও দারুণ ভয় পেয়ে ছুটলেন সেই পুকুরপাড়ে তাঁর ছেলের কাছে

ওই তো। ওই তো তাঁর ছেলেকে ঘিরে সবাই কেমন গোল হয়ে বসে আছে। তবে সত্যিই ভূতেরা ধরল ওকে? ছেলের তখন প্রবল জ্বর। অনবরত ভুল বকছে। শুধু বলছে, "ও বাবা গো! কী বড় বড় চোখ ও বাবা গো। আমাকে কামড়াতে আসছে। আমি মরে যাব বাবা গো। ওই দ্যাখো, আমার কাঠ সাজাচ্ছে।"

হালদারমশাই দেখলেন গতিক সুবিধের নয়। তাঁর যতরকম বিদ্যে জানা ছিল প্রয়োগ করে ছেলেকে তিনি সুস্থ করবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একটু সুস্থ হল ছেলেটি।

পরদিন সন্ধেবেলা ভূতেরা আবার হালদারমশাইকে বলল, "কী গুনিন, দেখলি তো আমাদের মহিমা? আমরা যা বলি তা করি। এখনও সময় আছে কিন্তু। তোর

ছেলেকে শুধু ধরেই একটু মোচড় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এবার কিন্তু জানে মেরে দেব। ভেবে দাখ কী করবি ? তোর কাছে খ্যাতি বড় না ছেলে বড় ? ভেবে দ্যাখ, তোর কিন্তু ওই একটিমাত্র ছেলে।”

হালদার বললেন, “আমার কাছে খ্যাতিই বড়। ছেলে নয়।”

“ঠিক আছে। হরিহরের বদলাটা তোর ছেলেকে দিয়েই নিতে হবে দেখছি। তবে আর একবার সুযোগ তোকে দেব।”

হালদার চিন্তান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। চিন্তার কারণ আছে বইকী! হতচ্ছাড়া ভূতগুলো আগে যদি কিছু বলত, তখন না হয় চিন্তা করে দেখা যেত। কিন্তু এখন নিজের হাতে লোকের গলায় কবচ বেঁধে সেই কবচ খুলে আনবে কী করে? এদিকে ওদের যত রাগ এখন ছেলেটার ওপর পড়েছে। হালদারমশাইয়ের সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরতেই হালদারমশাইয়ের স্ত্রী তো কেঁদে এসে হালদারের পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন।

হালদার বললেন, “কী ব্যাপার! হল কী তোমার? কাঁদছ কেন?”

“তার আগে বলো, তোমার কি সত্যি-সত্যিই মতিচ্ছন্ন হয়েছে?”

“তার মানে ?”

“তার মানে তুমি ভালরকমই জানো।”

“আরে! কী হল বলবে তো?”

“কী হল তুমি জানো না? এই তো একটু আগে পুকুরঘাটে আমাকে দেখা দিয়ে ওরা বলে গেল তুমি নাকি ওদের কথায় রাজি হচ্ছ না? ওরা বলছে এখনও সময় আছে হালদারমশাইকে একটু বুঝিয়ে বলে যেন ওই কবচটা কালই গিয়ে খুলে নিয়ে আসে। ওরা এ-কথাও বলেছে, আমরা সচরাচর কারও ক্ষতি করি না। ওই লোকটাকে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের জরুরি মিটিং-এর দিন ও জোর

করে ওই মাঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওরা বারবার বলেছে তুমি ওঝাগিরি করছ বলে ওদের কোনও রাগ নেই তোমার ওপর কিন্তু ওদের কথা তুমি যদি না শোনো, যদি তুমি ওদের মুখের গ্রাস ফিরিয়ে না দাও তা হলে তোমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ওরা তোমার ছেলেকে মারবে। আমাকে মারবে। এখন বলো তোমার এত দরদ কেন ওদের ওপর ? কীসের এত জেদ তোমার ? শুধু তোমার গোয়ার্তুমির জন্যই না ওরা আমার ছেলেটার মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত ওঠাল। সব জেনেশুনেও চুপ করে আছ তুমি? তুমি বাপ না পিশাচ ?"

হালদারমশাই এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে বললেন, "ওরা বুঝি এইসব কথা বলেছে তোমাকে ?"

"না বললে জানলাম কী করে বলো ?"

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানো, আমি ওই কবচ কী করে খুলে আনব?"

"কেন? কাল সকালেই তুমি অন্য একটা বাজে কবচ হাতে নিয়ে ওদের বাড়ি যাও। তারপর গিয়ে বলো, এই নতুন কবচটা আরও বেশি জোরালো। এই কথা বলে আসল কবচটা খুলে নিয়ে নকল কবচ পরিয়ে চলে এসো। ভূতেরা বলেছে ওই কবচ খুলে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরলেই ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে মেরে ফেলবে লোকটাকে। ঝামেলা একেবারেই চুকে যাবে।"

হলদারমশাই বললেন,"বেশ।তাই করব। ওরা আবার এলে এই কথাই তুমি বলে দিও।"

হালদারগিন্নি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

পরদিন সকালে হালদারমশাই নতুন একটি কবচ নিয়ে আবার গেলেন মথুরাপুরে। হরিহর তখন গোয়ালে গোরু-বাছুরের দেখাশোনা করছিল। হালদারমশাইকে দেখেই এগিয়ে এল সে, "ব্যাপার কী হালদারমশাই?"

হালদারমশাই বললেন,“ব্যাপার কিছুই নয়। শুধু দেখতে এলাম আর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা।”

“কী যে বলেন। আপনার দেওয়া কবচ গলায় বেঁধে রেখেছি। ভূত তো ভূত, ভূতের বাবারও আর সাধ্য নেই যে এখানে আসে।”

“ঠিক আছে। এখন ওই কবচটা তুমি আমাকে ফেরত দাও।”

“সে কী!”

“ভয় নেই। এই কবচের বদলে তোমাকে আর একটা এমন কবচ দেব যে, তা আরও সাঙ্ঘাতিক। এই কবচটা তো শুধু তোমাকেই রক্ষা করবে, কিন্তু এই নতুন কবচ রক্ষা করবে তোমার পুরো পরিবারকে।”

এই কথা শুনে হরিহর সরল বিশ্বাসে কবচটা খুলে দিল হালদারমশাইকে। তাঁরই দেওয়া জিনিস তিনি ফিরিয়ে নেবেন, এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার হয়তো একদিন নতুন কোনও কবচ দেবেন। এরকম তো হতেই পারে। তাই সরল বিশ্বাসে কবচটা হালদারমশাইকে দিয়ে দিল হরিহর।

হালদারমশাই নিজে হাতে ওর গলা থেকে রক্ষাকবচটি খুলে নিয়ে নতুন একটি নকল কবচ বেঁধে দিলেন। তারপর ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে এলেন ওদের বাড়ি থেকে। মথুরাপুরের সীমানা যেই পেরিয়েছেন অমনই শুনতে পেলেন কে যেন বলল, “আমাদের রাজা তোর ওপর খুব খুশি হয়েছে গুনিন। আমরা তোর ওপর সন্তুষ্ট। আর তোর বউ-ছেলের কোনও ভয় নেই। এখন ওরা নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। তোর ছেলের ওপর থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি। আর এও বলে রাখছি, আমরা যদি কাউকে কখনও ধরি আর ওঝা হয়ে তুই যদি সেখানে যাস, তা হলে তোকে দেখামাত্রই আমরা তাকে ছেড়ে দেব।”

হালদারমশাই নিশ্চিন্ত হলেন। একজন রোগীকে সারাতে না পারলেও এরকম অনেক রোগীকে যদি বাঁচাতে পারেন, সেটাই বা মন্দ কী! তাঁর কর্মদক্ষতা তাতে কিছুমাত্র কমবে না। বরং উত্তরোত্তর সুনাম বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

ওদিকে হালদারমশাই চলে আসামাত্রই হরিহরও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর বাড়ির লোকেরা দেখল হরিহরের মুখটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হরিহর কথা বলতে পারছে না। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এক অদ্ভুত আতঙ্কে নীল হয়ে আসছে ক্রমশ । বাড়ির লোকেরা দেখতে না পেলেও হরিহর বেশ বুঝতে পারল কালো পোড়া দুটো হাত ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাইছে। হরিহরের শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ও ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। ওর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে।

ওর বাড়ির লোকেরা গুনিনকে ডাকতে ছুটল। কিন্তু গুনিন তখন কোথায়? গুনিন তখন নাগালের বাইরে।

ব্রহ্মডাঙার মাঠ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

যে সময়কার কথা বলছি তখন আমার বয়স চোদ-পনেরোর বেশি নয়। মাকড়দার কাছেই আছে ঝাঁপড়দা। নামটা শুনলেই তখন হাসি পেত। তা সেই ঝাঁপড়দাতে আমাদের এক বন্ধু ছিল, তার নাম ক্যাবা। ক্যাবলাকান্ত থেকে ক্যাবা কিনা জানি না, ওই নামেই তাকে ডাকত সবাই । তা সেই বন্ধুটি বেগুড়পাড়ায় মুড়িউলি মাসির বাড়িতে আসত বলেই তার সঙ্গে আমার এবং আমার বন্ধুদের পরিচয়।

সে যাই হোক, একদিন ক্যাবা আমাদের ধরে বসল দু-একদিনের জন্য ওদের গ্রামে যেতে হবে। ওর এই আমন্ত্রণে আমরা কেউ না করলাম না। গোরা, আমি আর পল্টন তিনজনেই লাফিয়ে উঠলাম। যেহেতু মুড়িউলি মাসির বোনপো, তাই বাড়িতেও কেউ এই যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করল না। মুড়িউলি মাসির বাড়ি নার্নায়। ক্যাবাদের দক্ষিণ ঝাঁপড়দায়। আমাদের হাওড়া শহর থেকে জায়গাটার দূরত্বও বেশি নয়।

একদিন সকালে ক্যাবার সঙ্গেই আমরা চললাম ওদের দেশে। তখন হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানির ট্রেন চালু ছিল। সেই ট্রেনে চেপে আমরা ঘণ্টা দেড়েকের জার্নির পর ডোমজুড়ে এসে নামলাম।

ডোমজুড় তখন এত উন্নত ছিল না। চারদিকে মাটির অথবা ছিটেবেড়ার ঘর এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এইখান থেকে দক্ষিণ ঝাঁপড়দা হয়ে একটি বনপথ সোজা চলে গেছে নানার দিকে। নার্নার পঞ্চানন্দ হলেন অত্যন্ত জাগ্রত।

যাই হোক, সেই পথ ধরে একসময় শ্মশান পার হয়ে একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমরা। সেইখানে অনেক সুপ্রাচীন বট ও অশ্বত্থের সমারোহ দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তারই মাঝে বহুদিনের পুরনো একটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বাড়িতে এসে ঢুকলাম আমরা।

ক্যাবা বলল, "এই আমাদের বাড়ি।" বাড়ির চেহারা দেখে বুক শুকিয়ে গেল। এ তো ভূতের বাড়ি। এই বাড়িতে কোনও মানুষ বাস করে? বাড়ির ইটগুলো সব নোনা লেগে ঝরে পড়ছে। কোথাও জোরে একটু শব্দ হলেও বোধ হয় ভেঙে পড়বে বাড়িটা। এই বাড়ির দোতলার একটি ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল।

সব দেখেশুনে গোরা বলল, "খুব জোর একটা রাত, তার বেশি নয়। কাল সকাল হলেই পালাব আমি।"

পল্টন বলল, "এ নির্ঘাত ভূতুড়ে বাড়ি। আজ রাতে ভূত এসে যদি আমাদের গলা টিপে না মারে তো কী বলেছি।"

আমি বললাম, "তার চেয়েও বেশি ভয় হচ্ছে আমার সাপ অথবা বিছের।" যে ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরে সাবেক কালের একটা পুরনো পালিশ ওঠা ভাঙা খাট ছিল। তাতে ছিল দুর্গন্ধযুক্ত তেলচিটে বালিশ আর চটের ওপর ছেড়া কাঁথা বিছানো গদি। এই বিছানায় শুতে হবে ভেবেও গা যেন ঘুলিয়ে উঠল।

একটু পরে ক্যাবা আমাদের নীচে নিয়ে গিয়ে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওঁরা সবাই খুব খুশি হলেন আমাদের দেখে। ক্যাবার মা বললেন, "গরিবের বাড়িতে কেউ তো আসে না বাবা, তোমরা এসেছ বলে খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। আমাদের ঘরদোর ভাল নয়, বিছানাপত্তর ভাল নেই। খুব কষ্ট হবে তোমাদের।"

ক্যাবার মায়ের আন্তরিকতাপূর্ণ কথা শুনে মন ভরে গেল আমাদের। সত্যিই স্নেহময়ী জননী তিনি। বললাম, "তাতে কী ? ও আমরা ঠিক মানিয়ে নেব।"

ক্যাবার মা বললেন, "যাও, কুয়োতলায় গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসো। আমি তোমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করি।"

আমরা ক্যাবার সঙ্গে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিলাম। ও দড়ি-বালতি নিয়ে জল তুলে দিতে লাগল। আমরাও জল খরচ করতে লাগলাম। তারপর গামছায় মুখ-হাত মুছে ঘরে আসতেই ক্যাবার মা আমাদের প্রত্যেককে মেঝেয় আসন পেতে বসিয়ে গরম গরম লুচি, আলুভাজা, বোদে আর পানতুয়া খেতে দিলেন। খুব তৃপ্তির সঙ্গে আমরা খেয়ে নিলাম সেগুলো ।

খাওয়াদাওয়া হলে আমরা ক্যাবার সঙ্গে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখানে এত ঘন ও বড় বড় গাছ চারদিকে যে, মনে হল এর পত্রছায়া ভেদ করে সূর্যের আলো বোধ হয় কারও ঘরে কখনও ঢোকে না। দিনমানেও তাই অন্ধকার।

যাই হোক, এইভাবে আমরা সারা গ্রাম তোলপাড় করে একসময় স্টেশনের দিকে এগোলাম ।

এখানটা তবু জমজমাট। চাঁপাডাঙার দিকে যাওয়ার জন্য একটি ট্রেন তখন তার দেশলাই খোলের মতো শরীর নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আমরা যাওয়ার পরই হুইসল দিয়ে নড়ে উঠল ট্রেনটা। আর তার একটু পরেই চারদিক থেকে রব উঠল, গেল-গেল-গেল।

কী ব্যাপার? না, স্টেশন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণবাড়ির মাঠের দিকে যেতে গিয়ে একটা ছাগলকে চাপা দিয়ে উলটে গেছে ট্রেনটা।

আমনই ছোট-- ছোট— ছোট।

অনেক লোকের সঙ্গে আমরাও ছুটলাম। কতকগুলো লোক ট্রেনের মাথায় বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে যাচ্ছিল, তাদেরই অনেকে ছিটকে ছুটকে পড়ায় লেগেছে খুব। বাকি যারা, তারা ট্রেনের কামরা থেকে সামান্য আঘাত পেয়ে বেরিয়ে এসে দড়ি বাঁশ ইত্যাদি নিয়ে চেষ্টা করছে আবার কামরাগুলোকে লাইনের ওপর তুলে বসানোর জন্য। একটা বোকা পাঠা এমনভাবে কাটা পড়েছে যে, তার ধড় একদিকে মুণ্ডু আর একদিকে হয়ে গেছে।

যাই হোক, প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় কাত হওয়া দু-তিনটে বগিকে ঠিকভাবে বসানো হল।

আবার নড়ে উঠল ট্রেন। আমরাও বিদায় নিলাম। দুপুরবেলা স্নানপর্ব শেষ হলে মধ্যাহ্নভোজন। কাসার থালায় মোটা চালের ভাত। বড় জামবাটিতে করে পেয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল। এছাড়া শাকভাজা, আলুভাজা, ঢ্যাঁড়সভাজী। পোস্তর চচ্চড়ি, শোলমাছের ঝোল আর আমের চাটনি তো ছিলই সময়টা তখন গরমের দিন। বৈশাখ মাস।

আমরা বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে সুপুরি এলাচ মুখে দিয়ে ওপরের ঘরে শুতে এলাম। এতক্ষণে কিন্তু পরিবেশটা আমরা মানিয়ে নিতে পেরেছি। খাটে না শুয়ে ঘরের মেঝেয় মাদুর পেতেই আমরা শুয়ে পড়েছি। শুয়ে শুয়ে কত গল্পই না হল আমাদের! বেশি গল্প করতে লাগলাম ট্রেন ওলটানোর ওই ব্যাপারটা নিয়ে। ভাগ্যে বগিগুলো সব কাত হয়েছিল, না হলে কেউ না কেউ মরতই।

পল্টন বলল, “রেল দুর্ঘটনায় মরলেই লোকগুলো সব ভূত হত।”

গোরা বলল, “তা কেন হবে ? ওরা হত কন্ধকাটা।”

আমি বললাম, “বা রে! কন্ধকাটা বুঝি ভূত নয়?”

ক্যাবা বলল, "যতক্ষণ না কেউ নিজে থেকে রেললাইনে মাথা দিয়ে গলা না কাটাবে ততক্ষণে সে কন্ধকাটা হবে না। তবে অপঘাতে মরলে অন্য ভূত সে হবেই।"

আমাদের যখন এইরকম সব আলোচনা হচ্ছে তখন হঠাৎই নাদাপেটা কদমছাঁটা একটা ছেলে এসে ক্যাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি ফিসফিস করে কী যেন বলল।

শুনেই তো লাফিয়ে উঠল ক্যাবা। বলল, "দারুণ হবে রে! কোথায় করবি ? ব্রহ্মডাঙার মাঠে ? তবে আর দেরি কেন? জোগাড়যন্তর কর সব।"

ছেলেটা চলে যেতেই ক্যাবা এসে বলল, "আজ রাতে একটা জোর পিকনিক হবে আমাদের। খালধারে ব্রহ্মডাঙার মাঠে। তোরাও থাকবি।"

পল্টন বলল, "বলিস কী রে! তা মেনুটা কী শুনি?"

"গরম ভাত, পাঁঠার মাংস আর আমের চাটনি।"

গোরা বলল, "চাঁদা কত করে? পাঠার তো অনেক দাম।"

ক্যাবা বলল, "তেল-নুনটা ঘর থেকেই জোগাড় হয়ে যাবে। চালেরও অভাব হবে না। আমও আছে গাছের ডালে, দু-চারটে পেড়ে নিলেই হবে। কিনতে হবে শুধু গুড়, চিনিটা। মাংসটা তো ফাউ। অর্থাৎ কিনা তখনকার সেই কাটা পড়া পাঠাটাই হবে আজ রাতে আমাদের খোরাক। আমার বন্ধু ওই হেবোটা সবার নজর এড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে এসেছে পাঁঠাটাকে। অমন নধর পাঠা সচরাচর পাওয়া যায় না। সত্যি, ভোজটা যা হবে না!"

ক্যাবার কথায় গোরা, পল্টন উৎসাহিত হলেও আমার মন কিন্তু সায় দিল না। বললাম, "দ্যাখ, খাওয়ার জন্য একটা পাঠাকে যদি কাটা হয় বা ঠাকুর দেবতার থানে বলি দেওয়া হয়, সে আলাদা কথা। কিন্তু রেলে কাটা পড়া বা অন্য

কোনওভাবে অপঘাতে মরা কোনও প্রাণীর দেহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করাই ভাল।”

ক্যাবা বলল, “দুর বোকা, কেটে খাওয়া আর রেলে কাটা পড়া একই ব্যাপার হল। কিছুই হবে না ওতে। চল তো !”

আমার গা ঘিনঘিন করলে কী হবে, গোরা আর পল্টনের দেখলাম উৎসাহ খুব। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতেই হল ওদের সঙ্গে।

ব্রহ্মডাঙার মাঠে তখন হেবো ছাড়াও আরও দু-তিনজন জড়ো হয়েছে। সবাই মিলে একটা গাছের ডালে পাঠাটাকে ঝুলিয়ে তার ছাল-চামড়া ছাড়াতে লেগে গেছে।

এই করতে-করতেই বেলা কাবার। সন্ধেবেলা মাঠে গর্ত করে সেই গর্তের মুখে ইট বসিয়ে উনুন তৈরি করা হল। তারপর শুকনো ডালপাল জোগাড় করে তাই জ্বাল দিয়ে শুরু হল রান্নাবান্না। দেখতে দেখতে আমরা প্রায় দশ-বারোজন হয়ে গেলাম। আমের চাটনি, ভাত আগেই তৈরি হয়েছিল। গরম গরম মাংস রান্না হলেই শুরু হবে খাওয়াদাওয়া। কুমোরদের বাড়ি থেকে কিছু মাটির গেলাস চেয়ে আনা হয়েছিল। একটা বালতিতে করে নিয়ে আসা হয়েছিল এক বালতি জল। ক্যাবা একটা কলাগাছ থেকে কতকগুলো পাতা কেটে এনেছিল। সবই ঠিক ছিল। কিন্তু সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেল খেতে বসবার সময়।

গরম মাংসর হাঁড়ি উনুন থেকে যেই না নামানো আমনই শুনতে পেলাম, “ব্য-ব্যা-ব্যা।” চমকে উঠলাম সবাই, এত রাতে ব্রহ্মডাঙার মাঠে কাদের ছাগল ডাকে? যেমন-তেমন ডাক নয়, অন্তিমের ডাক বলির আগে পাঠারা যেভাবে ডাকে, ঠিক সেইরকম। আর তারপরই মনে হল, মাঠময় কী যেন ছুটে বেড়াচ্ছে।

একটু পরেই হঠাৎ একটা ঢিপ করে শব্দ। যেন ভারী কিছু একটা লাফিয়ে পড়ল গাছের ডাল থেকে। আমাদের সঙ্গে দুটো হ্যারিকেন ছিল। সে দুটোও নিভে

গেল দপদপিয়ে। আর সেই অন্ধকারে আমরা দেখতে পেলাম কিম্ভূতকিমাকার একটা মূর্তি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রান্না হওয়া সেই মাংসর হাঁড়িটার দিকে।

আমরা তখন আর আমাদের মধ্যে নেই। বাবা রে মা রে করে যে যেদিকে পারলাম পালালাম। ক্যাবা, আমি, গোরা আর পল্টন এক ছুটে ওদের বাড়িতে।

ক্যাবার মা তো সব শুনে খুব বকলেন ক্যাবাকে। বললেন, "বলিহারি রুচি তোদের! অপঘাতে মরা কোনও প্রাণিদেহর মাংস কেউ খায় ? তার ওপরে ভর সন্ধেবেলা তোরা গেছিস ব্রহ্মডাঙার মাঠে। ওটা যে একটা দোষান্ত মাঠ তা বুঝি ভুলে গিয়েছিস ?"

আমরা সবাই মাথা হেঁট করে বকুনি হজম করলাম। যাই হোক, সে রাতে মাংস-ভাতের বদলে দুধ-ভাত খেয়েই শুতে গেলাম আমরা। পরদিন সকাল হতেই আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পরে—অনেক পরে ক্যাবার মুখে শুনেছি, একটা মুণ্ডহীন ছাগলকে প্রায়দিনই সন্ধের পর রেললাইনের ধারে অথবা ব্রহ্মডাঙার আশেপাশে তার ছায়াশরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সে কারও ক্ষতি করে না, ভয় দেখায় না, ডাকেও না। শুধু দেখা দেয় আর মিলিয়ে যায়। তবে আমরা কিন্তু আর কখনও ও-মুখো হইনি।

দক্ষিণবাড়ির মাঠ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া শহরের ঐতিহ্য মার্টিন কোম্পানির ছোট্ট রেলগাড়িটি আগে তেলকল ঘাট থেকে ছাড়ত। তেলকল ঘাট থেকে ছেড়ে হাওড়া ময়দান, কদমতলা হয়ে বালিটিকুরি ইত্যাদির ওপর দিয়ে আমতা শিয়াখালা চাঁপাডাঙায় চলে যেত। তারপর তেলকল ঘাট ও হাওড়া ময়দান বন্ধ হয়ে গেলে ট্রেন ছাড়ত কদমতলা থেকে। পরে অর্থাৎ সেই বোমা পড়ার বছর, মানে এই গল্প লেখার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে কদমতলা থেকেও স্টেশন উঠে গিয়ে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি বাঙালবাবুর ব্রিজের তলা থেকে ছাড়ত। তা যাক, মার্টিন রেলের ইতিহাস এটা নয়। মানে সেই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের সালটা ঠিক মনে নেই, তবে সেটা বোমা পড়ার বছর। শহরের লোক সাইরেনের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে এবং বোমা পড়ার ভয়ে যখন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে তখনকার গল্প। এখন যেমন মফস্বলের বাসগুলোর অবস্থা, তখন ঠিক সেইরকম ছিল মার্টিন রেলের অবস্থা। এমনিতেই এই ট্রেনের ছাদে চেপে যেতে লোকে ভালবাসত, তার ওপর তখন যুদ্ধের বছর। প্রাণের ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে। কাজেই ওপর-নীচে গাদাগাদি করে লোক চলেছে দেশের দিকে।

তখন মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত। ভবনাথবাবুও সপরিবারে চলেছেন গ্রামের দিকে। কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছু ঠিক নেই। শুধু সবাই পালাচ্ছে তাই তিনিও পালাচ্ছেন। স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। খুবই গরিব লোক। টিকিটও কাটতে পারেননি। যাই হোক, ট্রেন তো তার আপন গতিতে ছাগলের মতো মুখ নেড়ে নেড়ে চলেছে। তিনিও কোনওরকমে এককোণে

ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে চলেছেন। ছেলেমেয়ে দুটি নিতান্তই ছোট্ট। ট্রেনের দুলুনিতে এবং রাতের আধিক্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রেনের ভিড় একটু একটু করে কমতে লাগল।

ডোমজুড় ছাড়ার পর একজন চেকার উঠলেন ট্রেনে।

ভবনাথবাবু নিজেও তখন বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

চেকার তাঁকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "আপনি এখনও নীচে বসে আছেন কেন? উঠুন। ওপরের সিট তো খালি হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলোকে শুইয়ে দিন।"

ভবনাথবাবু ঝেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছেলেমেয়ে দুটোকে সিটে শুইয়ে দিয়ে বউকে সিটে বসিয়ে নিজেও বসলেন। গাড়ি একদম ফাঁকা। এই ছোট্ট কামরাটিতে তাঁরা ছাড়া আর জনা চারেক লোক রয়েছে।

চেকার বললেন, "আপনাদের টিকিটগুলো দেখান। যাবেন কোথায়?"

ভবনাথবাবু বললেন, "আমি গরিব মানুষ বাবু একটা দোকানে বিড়ি বাঁধার কাজ করি। টিকিট কাটবার পয়সা আমার নেই।"

"বেশ, তা না হয় বুঝলুম। অনেকেই টিকিট কাটতে পারেননি। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়

"কোথায় যাব তাও জানি না। ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।"

"তার মানে?"

"এই ট্রেন যেখানে গিয়ে একেবারে থেমে যাবে, আমরা সেখানেই নেমে যাব।"

"এই ট্রেন তো চাঁপাডাঙা যাবে। আপনিও সেখানে যাবেন ? দেশ কোথায় আপনার ?"

"আমার দেশ ঘর নেই। ওখানে গিয়ে যার হোক আশ্রয়ে উঠব। আমার এই বাচ্চা দুটির মুখ চেয়ে কেউ না কেউ আশ্রয় দেবে নিশ্চয়ই।"

চেকারবাবু আর কোনও কথা না বলে অন্য যাত্রীদের টিকিট চেক করে দরজার হাতল টেনে পাশের কামরায় চলে গেলেন।

ডোমজুড় ছেড়ে দক্ষিণবাড়ির মাঠের ওপর দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে উড়িয়ে ট্রেন ছুটছে। এমন সময় হল কি, কলার খোসায় পা হড়কে মানুষ যেরকম উলটে যায় ঠিক সেইভাবে উলটে পড়ল ট্রেনটা। কী যে হল তা কে জানে? এক-একটা বগি দেশলাইয়ের খোলের মতো এক-একদিকে ছিটকে পড়ল। এর পর ভবনাথবাবুর আর কিছু মনে নেই।

ভবনাথবাবুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন তিনি হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের বিছানায় শয্যাশায়ী আছেন। ইতিমধ্যে তিন-তিনটে দিন কোথা দিয়ে কেটে গেছে। হাসপাতালে আহতদের কত লোক তো দেখতে আসছে। কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে এল না। ডাক্তার নার্স আয়া সকলকেই জিজ্ঞেস করেন তিনি, তাঁর খোঁজে কেউ এসেছিল কিনা বা তাঁর স্ত্রী পুত্রদের খোঁজখবর কেউ দিতে পারে কিনা, কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারল না তাঁকে। মনের দুঃখে এবং গভীর চিন্তায় ভবনাথবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন। আরও দু-চারদিন থাকার পর ছুটি হল তাঁর।

ছুটির পর প্রথমেই ফিরে এলেন তিনি নিজের বাড়িতে। যদি তাঁর বউ ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে আবার সেখানে ফিরে এসে থাকে, সেই আশায়। কিন্তু না। সেখানেও কেউ নেই। ছোট্ট ঘরটিতে আগের মতোই তালা দেওয়া। গভীর আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল তাঁর। হাতে একটিও পয়সা নেই। পেটে প্রচণ্ড খিদে। চেনাজানা প্রতিবেশীরা সকলেই প্রায় স্থানত্যাগ করেছে। এখন একমাত্র ভিক্ষে করা ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। যাই হোক, তবু ওরই মধ্যে এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতে নিজের বিপদের কথা বলে গোটা দুই টাকা ধার নিলেন। তারপর সামান্য কিছু জলযোগ সেরে হেঁটে হেঁটে কদমতলায় এসে ট্রেন ধরলেন। আমতার গাড়ি। সেই গাড়িতে করে তিনি ডোমজুড়ে এসে নামলেন। এর পর

লাইন ধরে শুরু হল হাঁটা। কেননা এইখানেই দক্ষিণবাড়ির মাঠের কাছে ট্রেনটা উলটে গিয়েছিল। ওদের খোঁজখবর হয়তো ওইখানেই পাওয়া যেতে পারে।

ভবনাথবাবু লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন দক্ষিণবাড়ির মাঠে এসে পড়লেন তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। এখানকার মানুষ তখনকার সেই দক্ষিণবাড়ির মাঠের রূপ কল্পনাও করতে পারবে না। এক গভীর জঙ্গলময় প্রান্তরে কিছু ধানজমি নিয়ে দক্ষিণবাড়ির মাঠ। সেখানে গিয়ে তিনি ঘটনাস্থল আবিষ্কার করে ফেললেন। দেখলেন দু-তিনটি বগি তখনও সেখানে উলটে পড়ে আছে। ভবনাথবাবুর দু'চোখে জল এল। কিন্তু এই মাঠের মাঝখানে কোথায় যাবেন তিনি, কাকেই বা কী জিজ্ঞেস করবেন ?

কিন্তু এই মাঠের মাঝখানে কোথায় এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন বেশ জোরালে টর্চের আলো ফেলে তাঁর সামনের সরু লাইন ধরে স্লিপারের ওপর দিয়ে কে যেন আসছে।

ভবনাথবাবু আশার আলো দেখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটি কঠিন গলায় বললেন, "কে আপনি! এখানে কী করছেন?"

ভবনাথবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন,"আজ্ঞে, কিছু করিনি।"

"কিছু করেননি তো এই ভর সন্ধেবেলা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আত্মহত্যা করতে এসেছেন? না ফিস প্লেট খুলছেন?"

"আজ্ঞে না না। ওসব কিছুই করিনি আমি।"

"তবে কি এই মাঘ মাসের শীতে এখানে এসেছেন হাওয়া খেতে? জানেন না মাত্র কদিন আগে এখানে একটা মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা হয়ে গেছে?"

ভবনাথবাবু বললেন, "জানি। সেই ট্রেনে আমিও ছিলাম।"

"আপনিও ছিলেন? সে কী ! আপনি মারা যাননি?"

"মারা গেলে তো আপদ চুকেই যেত মশাই। কিন্তু আমার বউ আর দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়েও সঙ্গে ছিল। তাদের কোনও খোঁজখবর না পেয়ে বড়ই চিন্তিত আছি। তাই আমি এখানে এসেছিলাম যদি কেউ তাদের কোনও একটা খোঁজখবর আমাকে দিতে পারে সেই আশায়।"

"অ। আপনি তা হলে সেই লোক।"

"কেন? আপনি আমায় চেনেন? আপনি কি তাদের খবর জানেন? বলুন না তারা কোথায় ? তারা বেঁচে আছে তো?"

এ-কথার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু টর্চের আলোটা নিভে গেল।

প্রথম কিছুক্ষণ চারদিকে অন্ধকার দেখলেন ভবনাথবাবু। তারপর আলো-আঁধারের ধাঁধা কাটলে চোখের সামনে যাকে দেখতে পেলেন তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। ইনি তো সেই চেকারবাবু। যিনি বিনা টিকিটের যাত্রী জেনেও কিছু বলেননি তাঁকে।

ভবনাথবাবু হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন,"বলুন, আমাকে দয়া করে বলুন তারা বেঁচে আছে কিনা ?"

চেকারবাবু ভবনাথবাবুকে বললেন, "আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"আপনার বউ আর ছেলেমেয়ের কাছে। তবে একটু তাড়াতাড়ি পা চালাবেন কিন্তু। আপনাকে পৌছে দিয়েই আমাকে ফিরতে হবে। আজও আমার নাইট ডিউটি কিনা।"

ভবনাথবাবু সেই অন্ধকারে রেলের স্লিপারে পা দিয়ে চেকারবাবুর পিছু পিছু এগিয়ে চললেন। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর মাঠে নামলেন দুজনে। মাঠে নেমেও খানিক গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন চেকারবাবু। তারপর দুরের একটা কলাবনের দিকে টর্চের আলো ফেলে বললেন, "ওই যে দেখছেন কলাবাগান,

ওইখানেই আমার বাড়ি। আমি আর বাড়ি পর্যন্ত যাব না। আমার দেরি হয়ে যাবে। আপনার বউ এবং ছেলেমেয়ে ওইখানেই আমার মায়ের নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। যান, চলে যান।”

ভবনাথবাবু সেই অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর মন কেনন যেন সন্দেহ হল। কেননা তাঁকে বাড়ি দেখিয়ে দেওয়ার পর চেকারবাবুর আর কোনও অস্তিত্বও দেখতে পেলেন না তিনি। তবে কি তিনি ভূতের পাল্লায় পড়লেন? তাঁর সারা গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। এ কোথায় এলেন তিনি ? জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই এখানে।

যাই হোক, তবু তিনি সাহসে ভর করে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে সেই কলাবাগানের কাছে এসে একটি মাটির ঘরে আলোর রেখা দেখতে পেলেন। আশপাশে আরও দু-একটি মাটির ঘরও রয়েছে। একটি ঘরের ভেতর থেকে এক মহিলার বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। ভবনাথবাবু থমকে দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর আস্তে করে বললেন, “বাড়িতে কে আছেন ?”

বলার সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল।

অমনই শুনতে পেলেন তাঁর ছেলেমেয়ে দুটির গলা, “ওমা! বাবা এসেছে। মাগো—”

ভবনাথবাবুর বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসে ভবনাথবাবুকে দেখেই আনন্দে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, “তুমি বেঁচে আছ? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি আবার তোমাকে ফিরে পাব বলে।”

ভবনাথবাবু ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এক বৃদ্ধা ঘরের ভেতরে মাদুর পাতা বিছানায় শুয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল। বলল, “কে গো বউমা ? তোমার উনি কি ফিরে এলেন ?”

"হ্যাঁ মা।"

বৃদ্ধ এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, "সবার সবাই তো ফিরে এল মা, আমার খোকা কবে ফিরে আসবে ? খোকাই যে আমার সব। সে ছাড়া আমি কী করে বাঁচব গো?"

ভবনাথবাবুর স্ত্রী আঁচলের খুঁট দিয়ে বৃদ্ধার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধা বলল, "দাও, ছেলেকে খেতে দাও মা। গরিবের ঘরে যা আছে, দুটি দাও।"

ভবনাথবাবুর স্ত্রী ভবনাথবাবুকে হাত মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে একটি বাটিভর্তি মুড়ি কলা দুধ গুড় ধরে দিলেন।

ভবনাথবাবু তৃপ্তির সঙ্গে সবকিছু খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ছেলেমেয়ে দুটিও বাবাকে পেয়ে আনন্দে ছুটোছুটি করতে লাগল।

এর পর ভবনাথবাবুর স্ত্রী উনুনে আঁচ ধরিয়ে আবার রাতের খাওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলেন। এইভাবে আপনজনকে ফিরে পেয়ে তাঁর আনন্দের আর অবধি নেই।

ভবনাথবাবুর মন ভরে উঠল গভীর প্রশান্তিতে। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে সে-রাতের মর্মান্তিক ঘটনার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। ভবনাথবাবুর স্ত্রী বললেন, ট্রেন দুর্ঘটনার রাতের কথা তাঁরও কিছু মনে নেই। যখন সকাল হল তখন দেখলেন বহু লোক উদ্ধারকার্যে নেমেছে। ছেলেমেয়ে দুটি তাঁর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে কাঁদছে। আহত লোকদের লরি করে হাসপাতালে হাসপাতালে পৌছে দেওয়া হয়েছে এবং নিহতদের দাহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখানে তোমার খবর কেউই দিতে পারল না। কিছু লোক আমাদের নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুলল। কেননা এই বুড়ির একমাত্র ছেলে রেলের চেকার এবং দুর্ঘটনায় সেও মারা গেছে। বুড়িকে অবশ্য বলা হয়নি সে-কথা। আমরাও

নিরাশ্রয়। তাই বুড়ির দেখাশোনার জন্য এখানে এসে উঠেছি। বুড়িকে অবশ্য বলা হয়েছে ওঁর ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মৃত্যুসংবাদটা এখনও দেওয়া হয়নি। কিন্তু তবুও মায়ের প্রাণ তো! হয়তো সবই বুঝতে পারে।

ভবনাথবাবু আর কোনও কথা বললেন না। কীভাবে তিনি এখানে এসেছেন সে-কথাটা একেবারে চেপে গেলেন। শুধু চারদিকে খোঁজখবর নিতে নিতে যে এখানে এসে পড়েছেন সেই কথাটাই শুনিয়ে দিলেন। এবং এও শুনিয়ে দিলেন যে, কাল সকালেই তিনি সবাইকে নিয়ে আবার হাওড়ার বাড়িতে ফিরে যাবেন। বুড়ির দেখাশোনা এখানকার প্রতিবেশীরাই করুক। তিনি থাকছেন না। তবে মনে মনে বুড়ির ছেলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কেননা তাঁর ধারণা ছিল ভূতেরা শুধু ভয়ই দেখায়। কিন্তু সুযোগ পেলে মানুষের উপকারও যে তারা করে, বুড়ির মৃত সন্তানের প্রেতাত্মাই তা দেখিয়ে দিল।

স্বর্গারোহণ পালা
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

খুব কম করেও পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা।

কলকাতার এক নামকরা যাত্রা কোম্পানি মেদিনীপুরের এক গ্রামে চলেছে তাদের দল নিয়ে যাত্রা করতে। তখনকার যাত্রাওয়ালারা আজকের মতো এমন লাক্সারি বাসে যাতায়াত করত না। চার-পাঁচটি গোরুর গাড়ি বোঝাই করে অভিনেতা ও দলের অন্যান্য লোকদের নিয়ে যাযাবরের মতো এক দেশ থেকে আর এক দেশে রওনা হত।

এই দলটিও চলেছে। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে, নদী নালা ডিঙিয়ে, বনজঙ্গল অতিক্রম করে চলেছে। দলের অধিকারী রাখহরি ভাণ্ডারী মহাশয় অত্যন্ত সদাশয় লোক। কোনও পার্টির কাছ থেকে দলের গাওনার জন্য বায়নানামা করার পর কথার খেলাপ করেন না। এবং নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগেই তিনি গন্তব্যস্থলে পৌছে যান। কিন্তু এবারের যাত্রায় মনে মনে তিনি একটু প্রমাদ গণলেন। গন্তব্যস্থল এখনও সাতক্রোশ দূর। অথচ আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ। ঘন মেঘমালায় আকাশ ভরে আছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গোরুর গড়ি যদি রেলগাড়ির মতো ছোটে তা হলেও তিনি দুর্যোগ এড়িয়ে পৌঁছতে পারবেন না। একেবারে নামে নামে অবস্থা। তবু তিনি চালকদের গাড়ির গতি দ্রুত করতে বলে চোখে আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন।

দলের লোকেরাও চিন্তিত হয়ে পড়ল খুব। তো, এইভাবে যাওয়া যায় কী করে! তারা বলল, "অধিকারী মশাই, এবার বোধ হয়েআমাদের দলের মান আর রইল না।"

অধিকার বললেন,"সে বললে তো হবেনা ভয়া। যত দুর্যোগই হোক, যেতে আমাদের হবেই।" ,

"তা তো হবেই। কিন্তু যাবেন কী করে? এ যা অবস্থা দখছি, এখানেই না আটকা পড়তে হয়!"

"জয় গুরু জয় গুরু। দেখা যাক কী আছে কপালে! একে আষাঢ় মাস, তাই আকাশের এই অবস্থা।"

"ওরা কি এই বর্ষাকাল ছাড়া যাত্রা করাবার সময় পেল না?"

"সে বললে কি হয়? গ্রামগঞ্জের ব্যাপার। চাঁদা তুলে পয়সা জোগাড় করবে তবে তো? বোশেখ মাসে হরিসভা দিয়েছিল, তখনই যাত্রা হওয়ার কথা। কিন্তু টাকাপয়সার জন্যই পিছিয়ে গেল। তাই এই অসময়ে হচ্ছে। ওদের বড় আশা, আমাদের দলের যাত্রাগান শুনবে। তাই দোনোমনে করেও বায়নাটা নিয়েই নিলাম।"

"কিন্তু আকাশ যেরকম করছে তাতে...।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এ যেন প্রলয়ের পূর্বাভাস।" | বলতে বলতেই ঝড় উঠল। সে কী দারুণ ঝড়। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। গাছ ওপড়াল। গোরুর গাড়ির ছতরি উড়ল। ধুলোয় কুটোয় ভরে গেল চারদিক। ঝড় আর জলের দাপট মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দেখা দিল । সামাল সামাল রব উঠল চারদিকে।

এদিকে যে গ্রামে যাত্রা হওয়ার কথা, তারাও তখন হায় হায় করছে। শুধু কি এই গ্রামের লোক? ভিন গা থেকেও দলে দলে লোক সকাল দুপুর থেকে চাটাই মাদুর থলে বিছিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে কলকাতার পেশাদারি দলের যাত্রা শোনবার জন্য। রাত দশটার মধ্যে যাত্রাপার্টির আসবার এবং বারোটায় যাত্রা আরম্ভ করবার কথা। তার জায়গায় এ কী হল ?

যাই হোক দুপুরের পর থেকে আরম্ভ হয়ে একটানা সেই দুর্যোগ রাত নটা নাগাদ কেটে গেল। চারদিকে কাদায় কাদা। নিচু জায়গাগুলো জলে ডুবে গেছে। কোথাও বা পথের ওপর দিয়ে জলস্রোত বইছে। শামিয়ানা ছিড়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে একপাশে। সবাই বিষণ্ণ মনে বসে বসে ভাবছে—তাই তো, যাত্রা হোক বা না হোক সেটা বড় কথা নয়। এই অজ গ্রামে আসতে গিয়ে অতবড় দলের লোকজনগুলোর কী অবস্থা হল? তারা যে কোথায় কতদূরে কীভাবে আছে তাই বা কে জানে? সবাই মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল, দেখো ঠাকুর যেন দলটির কোনও ক্ষতি না হয়। যাত্রা আজ না হয় কাল হবে। কিন্তু মানুষগুলো যেন প্রাণে বাঁচে।

গ্রামবাসীরা এইরকম সব চিন্তা করছে এমন সময় দেখা গেল পর পর পাঁচটি গোরুর গাড়ি কাদায় মাখামাখি অবস্থায় এসে থামল বারোয়ারিতলায়।

সকলে হইহই করে হ্যাজাক লণ্ঠন নিয়ে ছুটল সেখানে।

অধিকারী মশাই ভুড়ি দুলিয়ে নেমে এলেন গোরুর গাড়ি থেকে।

গ্রামবাসীরা অবাক! বলল, "এই দুর্যোগে আপনারা এলেন কী করে?"

"কেন! না আসবার কী আছে? আমার নাম রাখহরি ভাণ্ডারী। কথার খেলাপ আমি করি না। দুর্যোগে কষ্ট পেয়েছি ঠিকই, তবে ওসব আমাদের গা সওয়া। এখন আপনারা অনুমতি দিলেই যাত্রা আরম্ভ হবে।"

এর আবার অনুমতি! চোখের পলকে বারোয়ারিতলা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হ্যাজাক লণ্ঠনের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল চারদিক। যাত্রার কনসার্টের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল গ্রামখানি। কী আনন্দ কী আনন্দ। সেই আনন্দময় পরিবেশে যাত্রা শুরু হল। অগণিত দর্শক মুগ্ধ চোখে যাত্রা দেখতে লাগল। কেউ দুঃখে কাঁদল, কেউ-বা আনন্দে হাততালি দিল।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে এল।

যাত্রা শেষ হয়ে এল। কিন্তু এ কী! এও কি সম্ভব!

শেষ দৃশ্যে নরবলি আছে। এরা যে সত্যি-সত্যিই একটা লোককে হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে নরবলি দিল। তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেন। এদের আশীর্বাদে সেই কাটা মুণ্ডু আবার জোড়াও লেগে গেল। বিস্মিত অভিভূত দর্শকরা ভেবেও পেল না এসব কী হচ্ছে। এরকম সাংঘাতিক পালা এর আগে আর কখনও দেখেনি তারা। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। ব্রহ্মার বর দান করে আসরের মাঝখান থেকে হাউইয়ের মতন উড়ে স্বর্গে চলে গেলেন ।ব্রহ্মার পর বিষ্ণু আর মহেশ্বর। মাটি ছেড়ে তাঁদেরও দেহটা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল। শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নন। অন্যান্য কুশীলবরাও ওইরকম একই ভাবে স্বর্গারোহণ করলেন।

দর্শকদের তো তখন মুছা যাওয়ার অবস্থা। যাঃ বাবা। এসব আবার কী কাণ্ড!

এইসব ঘটতে ঘটতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। আর ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট পাটির লোকগুলোও কীরকম যেন আবছা হয়ে যেতে লাগল। আর কনসাটের সুরও মনে হল ক্রমশই যেন দূরে, বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই এক সময় সুরও মিলিয়ে গেল, লোকগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল।
।

পরদিন সকালবেলায় দেখা গেল পাঁচটি গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে একটি যাত্রার দল আসছে। গোরুর গাড়িগুলো বারোয়ারিতলায় এসে থামতেই অধিকারী মশায় হাতজোড় করে এসে বললেন, “হে সজ্জন গ্রামবাসীগণ, আপনার আমাকে ক্ষমা করুন। জীবনে এই প্রথম আমি কথার খেলাপ করলাম। কালপথিমধ্যে ভয়ংকর দুর্যোগে পড়ে আমরা বহু চেষ্টা করেও আসতে পারিনি। তবে আসতে যেমন পারিনি তেমনই ওই একই টাকার অঙ্কে পর পর দুরাত আমরা আপনাদের গ্রামে যাত্রাগান করব।আশা করি আপনারা সবাই খুব খুশি হবেন?”

গ্রামবাসীরা কী যে বলবে আর কী করবে।" আপনারা তো কাল ঠিক সময়েই এসেছিলেন। সারারাত ধরে অভিনয় করলেন। তারপর শেষরাতে ভেলকি লাগিয়ে চলেও গেলেন। আবার এখন এসেছেন হিঁয়ালি করতে? বলি ব্যাপার কী ?”

অধিকারী বললেন, “দেখুন মশাই, বাজে কথা বলবেন না। আমি হলুম সিংহরাশির জাতক। লোকের সঙ্গে হেঁয়ালি করার মতো মেজাজ আমার নেই। কাল রাতে দুর্যোগে আমরা আটকা পড়েছিলাম। এই সবে আসছি। সময়ে উপস্থিত হতে পারিনি বলেআমাকে বিরূপ করছেন? এই নিন আপুনাদের বায়নার টাকা।” বলে গেঁজে থেকে টাকার থলিটা বের করে অধিকারী মশাই ছুড়ে দিলেন সকলের সামনে।

সকলে হা হা করে উঠল, “থামুন, থামুন মশাই! আপনি হলেন স্বনামধন্য লোক। আমাদের গ্রামে আপনার মতো লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে রলে আমরা গর্বিত। আমরা কখনও আপনার মতো লোককে বিদ্রুপ করতে পারি? আপনি বিশ্বাস করুন, অত দুর্যোগেও কাল রাত্রে গ্রামে যাত্রা হয়ে গেছে এবং আপনার দলই করেছে।”

“তা কী করে সম্ভব!”

“বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার অভিনেতারা কে কীসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তা আমাদের গ্রামের যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।”

অধিকারী ভুকুঞ্চিত করে বললেন, “বেশ, বলুন তো দেখি?”

গ্রামবাসীরা বলল, “ওই তো উনি ব্রহ্মার পার্ট করেছিলেন। উনি হয়েছিলেন বিষ্ণু। উনি মহশ্বের। আর ওই যে উনি, ওঁকেই তো বলি দেওয়া হয়েছিল। উনি হয়েছিলেন অমুক-- উনি তমুক।”

অধিকারী বললেন, “আশ্চর্য! আমাদের এই পালা হচ্ছে এমরশুমের নতুন পালা। এ তো আপনাদের জানবার কথা নয়। অথচ আপনারা যে যা বলছেন, সবই ঠিক—উনি আমাদের দলে ব্রহ্মা সাজেন, উনি বিষ্ণু, উনি মহেশ্বর। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কাল রাতে আমরা আসতে পারিনি। আমরা দারুণ ঝড়জলে এখন থেকে সাত ক্রোশ দূরে হরিদাসপুর গ্রামে আটকে পড়েছিলাম। আপনারা ইচ্ছে করলে ওখানকার ভুবন মালাকারের বাড়িতে একজন লোককে পাঠিয়ে খবর নিয়ে আসতে পারেন।”

গ্রামের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিতে তাকাতে লাগল,“হরিদাসপুর গ্রাম! ভুবন মালাকার!”

অধিকারী বললেন, “হ্যাঁ। হরিদাসপুর গ্রাম। ভুবন মালাকার। কাল ওই দুর্যোগের রাতে ওই গ্রামের লোকেরা ভুবন মালাকারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাদের না তুললে সারারাত কী দুর্গতি যে হত আমাদের, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অমন অতিথিবৎসল গ্রাম আমি দেখিনি। অতগুলো লোককে পেটভরে খাইয়ে দাইয়ে রাত শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সড়কে পৌছে দিয়ে আপনাদের গ্রামে আসার সহজ পথটি দেখিয়ে না দিলে আজও বিকেলের আগে এখানে আমরা আসতে পারতাম না।”

অধিকারীর মুখে সব শুনে গ্রামের লোকেরা তো থ। বলল, “আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে কলেরার মহামারীতে ওই গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। হরিদাসপুরে এখন গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বন আর জঙ্গল।”

“আর ভুবন মালাকার?”

“ওই মহামারীর কবল থেকে তিনিও রক্ষা পাননি।”

“সে কী! কাল রাতে আমরা তা হলে ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম।”

"শুধু কি আপনারা? আমরাও যে কাল সারারাত জেগে কাদের যাত্রা দেখেছি তা এবার ভালই বুঝতে পারছি। উঃ কী সাংঘাতিক সেই যাত্রা। যাক, ভাগ্য ভাল যে, প্রাণে বেঁচে গেছেন। এখন বিশ্রাম করুন। তারপর রাত্রিবেলা মনের আনন্দে আপনাদের যাত্রা দেখব।"

অধিকারী বললেন, "না, রাত্রে নয়। যাত্রা আজ দুপুরেই হবে। তারপর রাত্রিটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালেই পালাব আমরা এখান থেকে। আর এ তল্লাটে নয়!"

অধিকারীর কথামতো তাই হল। দিনদুপুরেই খোলা আকাশের নীচে যাত্রা দেখল সকলে ।

এই অলৌকিক যাত্রাপালার কথা প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনার পরও এখনকার লোকেরা হেসে উড়িয়ে দেয়। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে, এটা একটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই নয়!

কী ভয়ঙ্কর রাত!

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

১৯৫০ সালের কথা। আমরা তিন বন্ধুতে জুনপুট বেড়াতে গেছি। তখন এখনকার মতো এমন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। কাঁথি থেকে গোরুর গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে জুনপুট যেতে হত। আমরা তিনজনে খুব ভোর ভোর রওনা হলাম কাঁথি থেকে। ইচ্ছেটা জুনপুটের নির্জন সমুদ্রতীরে ঝাউবনের শোভা দেখব। জেলেদের মাছধরা দেখব। আর দু'দিনের ছুটি উপভোগ করে ফিরে আসব কলকাতায়।

জুনপুট এখনও ভাল করে গড়ে ওঠেনি। তখনকার অবস্থা তা হলে বোঝ। না ছিল হোটেল, না ছিল থাকার ব্যবস্থা, না কোনও কিছু। জঙ্গলময় একটি গ্রাম ছিল জুনপুট। গ্রাম থেকে সমুদ্রতীরের দূরত্বও ছিল প্রায় এক মাইল। আমরা কাঁথি থেকে মাইল পাঁচেক পায়ে হেঁটে যাওয়ার পর জুনপুটের সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম।

আমাদের তিনজনেরই ছিল সেই প্রথম সমুদ্রদর্শন। সমুদ্রের বিশাল আকার দেখে আমাদের সে কী আনন্দ । তখন গ্রীষ্মকাল। এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢেউয়ের সে কী নাচুনি! তাই দেখে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্রতীরের চনচনে রোদের উত্তাপ এড়াতে আমরা তটসংলগ্ন ঝাউবনে বসে নানারকম আলোচনা করতে লাগলাম।

আমাদের সমস্যা হল থাকার ব্যাপার নিয়ে। একটা রাত্রি অন্তত এখানে না থাকলে ঠিক মন ভরবে না। কিন্তু থাকব কোথায়? কাছেপিঠে থাকার মতো কোনও আশ্রয়স্থানই দেখতে পেলাম না। কয়েকজন মাঝিমাল্লা সেখানে ঘোরাফেরা

করছিল। তাদের জিজ্ঞেস করতে কেউ কথার উত্তরই দিল না আমাদের। একজন শুধু বলল, “এখানে কেউ থাকে না বাবু। এখানে থাকার সেরকম ব্যবস্থা নেই। আপনারা কাঁথিতেই ফিরে যান।”

আমার সঙ্গে যে দু’জন বন্ধু ছিল তাদের একজনের নাম বিমান, অপরজনের নাম প্রশান্ত। বিমান বলল, “দেখুন আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি সমুদ্র দেখব বলে। তা আপনাদের নৌকোতেই আমাদের একটা রাত থাকার ব্যবস্থা করে দিন না।”

মাঝি বলল, “আমরা সন্ধের আগেই এখান থেকে চলে যাব। তা ছাড়া বিশ্বাস করুন, এ জায়গা ভাল নয়।”

“না না। কার কী আছে যে, চুরি ডাকাতি হবে?

অন্য উপদ্রব হয় এখানে, আপনারা থাকতে পারবেন না। কেউ থাকে না এখানে।”

বিমান বলল, “অন্য উপদ্রব মানে ভূতের উপদ্রব তো? তা হলে শুনুন, ভূতে আমরা বিশ্বাস করি না। আর ভূত বলে যদি কিছু থাকেও, তা হলে আমাদের উপদ্রবে তারাই পালাবে এখানে থেকে । ”

মাঝিটা এবার গম্ভীর মুখে তাকাল আমাদের দিকে। তারপর খুব রাগত স্বরে বলল, “বাবু, আমার মাথার চুল পেকে গেছে। আপনারা এখনও ছেলেমানুষ। অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোককে দেখলুম আমি। ওনাদের সম্বন্ধে একটু ভেবেচিন্তে মন্তব্য করবেন। বুঝতে পারছি আপনাদের নিয়তিই আপনাদের মুখ দিয়ে এইসব বলাচ্ছে। তবু বলছি শহর বাজারে যা করেন এখানে কোনওরকম গোয়ার্তুমি করবার চেষ্টা করবেন না। এ বড় খারাপ জায়গা।”

বিমান বলল, “বেশ তো, পরীক্ষা হোক। আপনাদের কুসংস্কার বড়, না আমাদের সাহস।”

“যা ইচ্ছে করুন। আমি এখানকার ব্যাপার জানি বলেই সাবধান করে দিলুম আপনাদের। আর একটু পরেই পাড়ি দেব আমরা সাগর দ্বীপে। কেউ থাকব না এখানে, তখন মরবেন।”

প্রশান্ত বলল, “সাগর দ্বীপ এখান থেকে কতদূর?”

“তা দূর আছে বইকী! বরং চলুন আপনারা আমাদের গ্রামে।”

“তাই কি পারি? এই ঝাউবনে আজ রাত্রে ভূতের সঙ্গে ডান্স না করে কী করে যাই বলুন ?”

মাঝি আর আমাদের সঙ্গে কোনও কথা না বলে পাশের একটি নৌকোর পাটাতনে উঠে ভাত খেতে বসে গেল।

আমরা তখন নিজেদের মনে সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে দিঘামুখী হয়ে এগিয়ে চললাম। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ঘন ঝাউবনের ভেতর হঠাৎ একটি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা হাল আমলের নয়। বহু পুরনো। দেখে কোনও রাজবাড়ি বলে মনে হল।

আমি বিমানকে বললাম, “ওই দেখ বিমান।”

বিমান বলল, “তাই তো রে! বাড়ি এখানে কোথেকে এল?”

প্রশান্ত বলল, “এগিয়ে চল তো দেখি। যদি এখানে কোথাও একটু থাকবার ব্যবস্থা ম্যানেজ করতে পারি।”

এমন সময় আমাদের পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, “ওটা ভূতের বাড়ি।”

আমরা পিছু ফিরে দেখলাম বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো গায়ের রং। পরনে হাফপ্যান্ট। সাদা সাদা দাঁত বের করে হাসছে।

বিমান বলল, “তুমি কে বাবা, ঝাউবনের কেলেমানিক ? তুমি নিজেই একটা ভূত নও তো?”

ছেলেটি বলল, “আমার নাম কেলেমানিক নাকি? আমার নাম তো বিশু।”

“তা বিশুই হও আর শিশুই হও, ওই বাড়িটা কাদের ?”

“রাজাদের। ও বাড়িতে এখন কেউ থাকে না। ওটাকে সবাই ভূতের বাড়ি বলে। রাত্রে ওখানে কুকুর ডাকে। বন্দুকের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। নাচগান হয়।”

“বলিস কী রে! এত কিছু হয় এখানে?”

“হ্যাঁ গো। মিথ্যে কথা বলছি না।”

প্রশান্ত বলল, “আমরা ওই বাড়িতে এক রাত্রি থাকতে চাই।”

বিশু বলল, “কেউ পারে না তো তোমরা। শখ মন্দ নয়! ওঃ! কী বলে? আমার বাবা ওই বাড়ির বাগানের মালী ছিল, বাবাই থাকতে পারে না।”

“তুই কখনও থেকেছিস ওই বাড়িতে?”

“আগে বাবার সঙ্গে থেকেছি।”

আমি বললাম, “আমরা যদি এক রাত ওই বাড়িতে থাকি, তোর বাবাকে বলে একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবি আমাদের ?”

“পারব। তবে এখানে কেউ থাকে না। যারা থাকে ভূতে তাদের গলা টিপে মেরে ফেলে।”

বিমান বলল, “গুল মারবার জায়গা পাসনি ব্যাটা? কেউ যদি থাকেইনা তো ভূতে গলাটা টেপে কার? তোর ?”

বিশু এ-কথার উত্তর দিতে পারল না।

প্রশান্ত বলল, “এই বাড়িতে থেকে তুই কাউকে মরতে দেখেছিস ?”

“না।”

“তবে চল। তোর বাবার কাছে নিয়ে চল আমাদের। তোর বাবা ব্যবস্থা করে দিলে এই বাড়িতেই আমরা রাত্রিবাস করব আজ।”

বিশু আমাদের ওর পিছু পিছু আসতে বলে ঝাউবনের বাইরে এল। তারপর ডানদিকের পথ ধরে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একজন বুড়ো মতো লোক জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে থলির বস্তায় পুরছে। বিশু বুড়োর কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল।

বুড়ো তাড়াতাড়ি বস্তা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ওই রাজবাড়ির বাগানের মালী ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমরা জুনপুট বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এখানে কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছি না। আপনি কি পারেন ওই বাড়িটাতে আমাদের এক রাত্রি থাকার ব্যবস্থা করে দিতে?"

"কেন পারব না? বাড়ির চাবি তো আমার কাছে। তবে কি জানেন, ও বাড়িতে থাকা উচিত নয়। ওটা ভূতের বাড়ি ও বাড়িতে এক রাত কেউ থাকলে সে পাগল হয়ে যায়।"

"ওই বাড়িতে থেকে পাগল হয়ে গেছে এমন কাউকে আপনি দেখাতে পারবেন?"

"না।"

"তবে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?"

বুড়ো বলল, "তা আমি বলি কি বাবু, আপনারা কাঁথিতেই ফিরে যান। এখানে রাত্রিবাস করবেন না।"

প্রশান্ত বলল, "কেন, ওখানে কোনও দলের গোপন আড্ডা হয় বোধ হয়?"

"না বাবু। গভীর রাতে ও বাড়িতে আলো জ্বলে। নাচগান হয়। বন্দুকের শব্দ শোনা যায়।"

আমি বললাম, "গুষ্টির মাথা হয়।"

প্রশান্ত বলল, "তবে হ্যাঁ, তুমি চাবি দিলে আজ রাত্রে ও বাড়িতে সত্যিই আলো জ্বলবে। নাচগান হবে। বন্দুকের আওয়াজ অবশ্য শোনাতে পারব না। আর এও দেখে রেখো, এই শেষ রাত। আমরা তিনজনে আজ সারারাত ধরে এমন ভূতের নাচ নাচব যে আর কখনও ওই বাড়িতে ভূতের উপদ্রবই হবে না।"

বুড়ো বলল, "এক মিনিট দাঁড়ান আপনারা।" বলে, হনহন করে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল একটা চাবির গোছা নিয়ে। বলল, "নিন চাবি। কাল কখন ফিরবেন আপনারা ?"

"তা ধরুন ভোরবেলা। "

"ঠিক আছে। আমি এখানেই থাকব। না থাকি বিশু থাকবে। চাবিগুলো ফেরত দিয়ে যাবেন। আর একটা কথা, ঘরের জিনিসপত্তরে দয়া করে হাত দেবেন না, বাগানের ফুল ছিড়বেন না।"

আমি বললাম, "না না, ওসব কিছু করব না আমরা।"

তারপর বললাম, "আচ্ছা এখন তো বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। এখানে খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়?"

"যান না, গ্রামে যান আপনারা। কোনও বাড়িতে টাকাপয়সা দিয়ে দেবেন, ওরাই রেঁধে দেবে। ফেরার সময় কারও কাছ থেকে একটা হারিকেন চেয়ে আনবেন।"

"আমাদের কাছে মোমবাতি আছে।"

"তা হলে তো খুব ভাল।"

আমরা চাবির গোছাটা সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই চলে গেলাম জুনপুট গ্রামে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এবং রাতের আহার সংগ্রহ করতে। যাওয়ার সময় দেখলাম সেই মাঝিরা তখন নোঙর খুলে সাগর দ্বীপে যাওয়ার জন্য তৈরি

হচ্ছে। আমরা তাদের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থাকলেও তারা কিন্তু ফিরেও তাকাল না আমাদের দিকে।

গ্রামে গিয়ে আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে রাতের জন্য কিছু মুড়ি আর রসগোল্লা নিয়ে আবার সমুদ্র সৈকতে ফিরে এলাম। সমুদ্র এখন আরও অশান্ত। আরও উত্তাল। যত জোরে হাওয়া বইছে সমুদ্র ততই ফুলছে। আমরা বালুচরের গা ঘেঁষে ঝাউবনে ঢুকলাম।

বিশু আমাদের দেখেই ছুটে এল। তারপর আমাদের আগে আগে চলতে লাগল সে। আমি বললাম, "কী রে ব্যাটা, বেশ তো মনের আনন্দে নাচতে নাচতে যাচ্ছিস। ভয় করছে না ?"

বিশু বলল, "ভয় করবে কেন? আপনারা তো আছেন। তা ছাড়া দিনের বেলা ওখানে কিছু হয় না, ভূত আসে রাত্রিবেলা।"

"তোরা দিনের বেলা ঢুকিস ওখানে?"

"আমরা কোনও সময়ই ঢুকি না।"

যাই হোক, আমরা সেই পুরনো রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত দোতলা বাড়ি। গেটের তালাটার অবস্থা দেখে মনে হল বেশ কয়েক বছর খোলা হয়নি এর দরজা। আমরা বহু কষ্টে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ঘন ঘাস ও আগাছায় ভরে আছে চারদিক। আর চাঁপা, গন্ধরাজ ও ম্যাগনোলিয়ার গন্ধে মম করছে। আমরা ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। বাড়িটা বাইরে যেমন পোড়ো বলে মনে হয়, ভেতরে কিন্তু তা নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হল দিনকতক আগে বুঝি কেউ এসে এখানে থেকে গেছে।

আমরা নীচের তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। নীচে-ওপর মিলে মোট দশখানা ঘর রয়েছে এ বাড়িতে। বড় বড় ঘর। মাঝখানে একটি হলঘর।

বিশু বলল, "এটা রাজাবাবুদের জলসাঘর।"

আমি বললাম, "এই ঘর থেকেই তা হলে গানবাজনার আওয়াজ শোনা যায় ?"

"হ্যাঁ।"

এই ঘরটি ছাড়া প্রায় সব ঘরই খাট আলমারি এবং নানারকমের দামি জিনিস দিয়ে সাজানো। খাটের ওপর পুরু গদি। দুধসাধা বেডশিট দিয়ে ঢাকা। যেন এইমাত্র পেতে রেখেছে কেউ। কোথাও এতটুকু ধুলোর আস্তরণ নেই।

বিমান বলল, "রহস্যটা বুঝতে পারছিস ? আসলে ভূতটুত কিছু নয়। এই বাড়ি রীতিমতো গোপনে ব্যবহার করা হয়। আর গ্রামের লোকেরা মনে করে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে।"

বিশু বলল, "আপনারা বিশ্বাস করছ না তো ? থাকো না রাত্রিবেলা, তারপর বুঝবে।"

প্রশান্ত বলল, "ভূত যদি থাকে তা হলে আমাদের সঙ্গে দেখা হবেই। আমরা আজ সারা রাত ধরে ভূতেদের সঙ্গে এই জলসাঘরে নাচগান করব। তারপর কাল সকাল হলেই ভূতগুলোকে ধরে সোজা নিয়ে যাব তোদের গ্রামে।"

আমি বললুম, "তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি বিশু? তা হলে দেখবি ভূতগুলোকে কী রকম জবদ করব আজ।"

বিশু বলল, "না বাবা। দরকার নেই।"

বিমান বলল, "তুই থাকলে হত কি, তোকে দেখেই ভূত পালাত। যা কালো তুই ভূতেরা বোধ হয় তোর চেয়ে ফরসা। ভূত এলেই আমরা তোকে দেখিয়ে বলতাম, এই দেখ তোদের বাচ্চাকে আমরা ধরে রেখেছি।"

বিশু বলল, "না, এ বাড়িতে কিছুতেই থাকব না।"

আবার চললাম সমুদ্রতীরে। কেননা সন্ধে হতে এখনও অনেক দেরি। কী করব অতক্ষণ ওই বাড়িতে চুপচাপ বসে থেকে? বিশেষ করে সারাটা রাত যখন ওই

বাড়িতে থাকতেই হবে আমাদের। তার চেয়ে সি-বিচে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়ালে সমুদ্রের অনেক নতুন নতুন রূপ দেখতে পাব। ঝাউবনে ঝাউয়ের হাহাকার শুনতে পাব। আসলে সমুদ্রদর্শনের জন্যই তো আমাদের এখানে আসা।

সমুদ্রে এখন ভাটার টান। জল যত সরে যাচ্ছে ততই বিভিন্ন রকমের ঝিনুকের খোলার বহর দেখা যাচ্ছে। আমরা কড়াকড়ি করে সেইসব ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম। এমন সময় দেখি আমাদের অদূরেই সেই নির্জন বালুচরে এক সুন্দরী মহিলা নিজের মনেই ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছেন। দেখে বেশ বড় ঘরের বউ বলেই মনে হল। এ মহিলা এখানে এলেন কোথেকে ?

হঠাৎ ঝাউবনের ভেতর থেকে এক স্মার্ট যুবককে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি আমাদের দেখে দূর থেকে বললেন, “এই যে ভায়ারা, শুনছেন?”

যাক, মহিলা তা হলে একা নন। আমরা তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। যুবক আমাদের দিকে তাকিয়ে সহস্যে বললেন, “আপনারা কি তারাই নাকি মশাই?”

“করা ?”

“মানে যারা নাকি ওই ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে চান?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“আপনারা কি সত্যিই ও বাড়িতে থাকবেন?”

“তা ছাড়া উপায় কী বলুন? এখানে সমুদ্রের ধারে ওই বাড়িটা ছাড়া আর তো রাত্রিবাসের উপযোগী কিছুই দেখছি না। এখন গ্রীষ্মকাল। ইচ্ছে করলে আমরা এই ঝাউবনে বা বালির চড়াতে রাত কাটাতে পারতাম। তবে ভয়টা তো ভূতের নয়। ধরুন যদি সাপে কামড়ায়। সাপকে ভয় করি। তাই সাহসে ভর করে ওই বাড়িতেই রাত কটাব আমরা। তা ছাড়া এও একটা অ্যাডভেঞ্চার। ভূতের গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু ভূতকে চাক্ষুষ কখনও দেখিনি। তাই জেদের বশে থাকছি ওই বাড়িতে। ভূত যদি থাকেও, এই সুযোগে তাঁর দেখাটা পেয়ে যাব।”

যুবক উৎসাহিত হয়ে বললেন,“তা হলে ভাই একটা কথা বলব?”

“বলুন।”

“আজ রাত্রে ওই বাড়িতে আমাদেরকেও আপনাদের সঙ্গী করে নেবেন?”

“সে কী ! ভয় করবে না আপনাদের ?”

“আমরা দু’জনে হলে ভয় করত। কিন্তু আপনারা যখন আছেন তখন ভয় কী?” আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, “দেখুন যতই সাহসে ভর করে থাকি না কেন, তবু আমরা তিনজন। আপনাদের পেয়ে আমাদেরও বুকে বল এল। আর কিছু না হোক, সারারাত গল্প করেও তো কাটাতে পারব।”

যুবক অদূরে ঝিনুক কুড়োতে ব্যস্ত থাকা মহিলাকে ডাকলেন, “স্বাতী, একবার শুনে যাও।”

মহিলা এক কোঁচড় ঝিনুক নিয়ে এগিয়ে এলেন। “এঁরাই সেই তিনজন। যাঁরা ওই বাড়িতে রাত্রিবাস করতে যাচ্ছেন। আমি এদের রাজি করিয়েছি আমাদের সঙ্গে নিতে।”

মহিলা খুব খুশি হয়ে বললেন, “অজস্র ধন্যবাদ।”

আমি বললাম, “আপনার ভয় করবে না ?”

“না ভাই। অত আমার ভূতের ভয় নেই। বিশেষ করে আপনাদের মতো ভাইদের সঙ্গে পেলে আমি এক রাত কেন দশ রাত ও বাড়িতে কাটাতে পারি।”

আমি বললাম, “খুব ভাল হল। আমরা অবশ্য কাল সকালেই কাঁথি চলে যাব। কিন্তু আমরা যে ওই বাড়িতে রাত্রিবাস করতে যাচ্ছি এ-কথা কে বলল আপনাদের ?”

“সবাই বলছে। সবাই জেনে গেছে আপনারা আজ ওই বাড়ির অতিথি।”

এমন সময় বিশু এল ছুটতে ছুটতে, “আমি বলেছি গো।”

অদূরে মালীবুড়োকেও দেখা গেল। মালীবুড়ো ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে কাছে এসে বলল, "এই তো, এনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে দেখছি। তা ভালই হয়েছে। দল বেঁধে থাকুন। তবে আমি এখনও বলছি, যা করছেন ঠিক করছেন না।"

সূর্য তখন অস্ত গেল। মালীবুড়ো বলল, "যান। একান্তই যাবেন যখন তখন এইবেলা চলে যান। আর দেরি করবেন না।"

বিশু হঠাৎ বলল, "বাবা আমি যাব ওদের সঙ্গে?"

মালীবুড়ো লাফিয়ে উঠল, "খবরদার। ওই বাড়িতে কেউ যায়? তুই যদি যাস তো আমার যেতে আপত্তি কী ?"

বিমান হঠাৎ ধরে বসল, "আচ্ছা, কেন আপনারা অহেতুক ভয় পেয়ে এত ভীত হচ্ছেন। কবে কী হয়েছে তা কে জানে? আমরা এতজন যখন আছি তখন ভয় কী? আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন না, আর আপনি ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন? আপনি নিজে এক রাত থেকেই দেখুন না! তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, ভূত আছে কি নেই!"

"কিন্তু বাবু, ওই বাড়ির ভেতর থেকে গানবাজনার আওয়াজ আমি নিজের কানে শুনেছি। একটা কুকুর কী সাংঘাতিক রকমের চিৎকার করে ডেকে ওঠে। রাতের অন্ধকারে ওই বাড়ির ভেতর আলো জ্বলে।"

"সেইজনাই তো বলছি, আজ রাত্তিরে আমাদের সঙ্গে থেকে আপনি নিজের চোখেই দেখে আসবেন ওখানে কী হয় না হয়।"

মালীবুড়ো একটু ভেবে বলল, "আবার ওই বাড়িতে আপনারা আমাদের ঢোকাবেন ? ঠিক আছে, আপনারা যান। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে রাত্রে শোওয়ার সময় যাব।"

"যাক, পথে এসেছেন দেখছি, ভূত থাকলেও ভূত আপনার কী করবেটা শুনি ? গলা টিপে মেরে ফেলবে এই তো? যদি মেরেই ফেলে, তাতেই বা হয়েছেটা কী ? বলি, বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে। আর কতদিন বাঁচবেন ?"

মালীবুড়ো বলল, "যান। তাড়াতাড়ি যান। ফটকট খোলা রাখবেন। আমরা সময়মতো যাব।"

মালীবুড়োকে বিদায় দিযে আমরা পাঁচজন ঝাউবনের ভেতরে সেই পোড়ো বাড়িতে এসে ঢুকলাম। সঙ্গে টর্চ ছিল। টর্চের আলোয় পথ দেখে দোতলায় উঠে পাশাপাশি দুটাে ঘর নিয়ে নিলাম আমরা। বাতি জ্বাললাম।

মহিলা তো ঘর দেখে দারুণ খুশি, "অ্যা! এমন চমৎকার ঘর। খাট বিছানা। রাজবাড়ি একটা। এরা বলে কিনা ভূতের বাড়ি! আমার তো মনে হচ্ছে সারাজীবন এইখানেই থেকে যাই।"

আমি বললাম, 'সত্যি! কী সংস্কার বলুন তো মানুষের ?" এর পর আমরা গোটা বাড়িটাতে দাঁপিয়ে বেড়ালাম প্রায়। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে সবাই মিলে ছাদে উঠলাম। আঃ, কী শান্তি! মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ।

আমি রাতের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, "ভূত বাবাজি, আমরা আজ রাত্রে আপনাদের অতিথি। আপনারা কোথায়?"

মহিলা খিলখিল করে হেসে জোরে উত্তর দিলেন, "সাড়া দেব না।"

আমি হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বললাম, "তা বললে কী হয়? বলুন না কোথায়?"

মহিলা হেসে লুটোপুটি খেতে-খেতেই উত্তর দিলেন "আমি এইখানে। আপনাদের সামনে।"

"আপনার নামটা জানাবেন দয়া করে।"

"হ্যাঁ। আমার নাম স্বাতী।"

যুবকও আমনই হাসতে হাসতে বললেন, "আমার নামটাও জেনে নিন। আমার নাম অরুণকুমার।"

এবার আমরা সকলেই হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লাম। আমি বললাম, "যাক, আজ রাত্রে আমরাই তা হলে ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করব।"

যুবক অর্থাৎ অরুণকুমার বললেন, "সত্যি, আপনাদের পেয়ে যে কী ভাল লাগছে আমাদের! না হলে আমরা দু'জনে তো হাঁফিয়ে উঠছিলাম।"

স্বাতীদি বললেন, "চলুন। বেশি রাত করে লাভ নেই। খাওয়াদাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। আমাদের টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি লুচি আর মাংস আছে।" -

"আমরাও মুড়ি মিষ্টি নিয়ে এসেছি।" স্বাতীদি ঠোঁট উলটে বললেন, "এ রাম! মুড়ি কে খাবে? মুড়ি আমি খেতে পারি না। তার চেয়ে মিষ্টিগুলো বরং কাজে লাগান। আপনারা বসুন। আমি টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে আসছি।"

আমি বললাম, "না না, স্বাতীদি। একলা যাবেন না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান। প্রশান্ত তুই বরং যা।"

"কোনও দরকার নেই। এত ভূতের ভয় করি না আমি। তা বলছিলাম কি, আপনাদের সঙ্গে খাবার জল আছে তো?"

"আছে। আমাদের ঘরে দেওয়ালের হুকে ওয়াটার বটলটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।"

স্বতীদি সিঁড়ির দরজার কাছে যেতেই আবার বাধা দিলাম,"শুনুন, একলা যাবেন না কিন্তু।"

স্বাতীদি হেসে বললেন, "আমি একলাই যাব।"

আমি অরুণবাবুকে বললাম, "দাদা ওঁর কথা শুনবেন না। আপনিই বরং ওঁর সঙ্গে যান। বলা যায় না তো, যদি কিছু দেখে ভয়টয় পান।"

অরুণবাবু বললেন, "ঠিক।" বলে স্বাতীদির সঙ্গে গেলেন।

একটু পরেই সবকিছু নিয়ে ওপরে উঠে এলেন ওঁরা। তারপর ছাদে বসে বেশ জুত করে লুচি, মাংস আর রসগোল্লা খেলাম। খেয়ে জলটল খেয়ে ঘড়ি দেখলাম, রাত বারোটা।

স্বাতীদি বললেন, "আর ছাদে নয়। এবার নীচে চলুন। ওঃ, কী আনন্দের দিন আজ। আমার চোখে তো একটুও ঘুম আসছে না। চলুন, এবার আমরাই সারারাত ধরে গান গেয়ে, চেঁচিয়ে, হল্লা করে ভূতের উপদ্রব করি। এমন উপদ্রব করব যে, ভূত বলে যদি কিছু থাকেও, তারাও ভয়ে পালাবে।"

বিমান বলল, "ঠিক কথা।" আমরা যেই উঠতে যাব অমনই কোথা থেকে একটা কেঁদো কুকুর এসে হাজির হল সেখানে।

স্বাতীদি লাফিয়ে উঠলেন, "ও মা! এ কী! এ কী! এখানে কুকুর এল কোথা থেকে?" কুকুরটা তখন স্বাতীদির পায়ের কাছে এসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

প্রশান্ত বলল, "এই হচ্ছে তা হলে পোড়ো বাড়ির ভূত। রাত্রিবেলা চেঁচাবে আর লোকে ভাববে ভূতে ডাকছে।"

কুকুরটা এবার স্বাতীদিকে ছেড়ে আমাদের এটাে পাতাগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর কড়মড় করে মাংসের হাড়গুলো খেতে লাগল চিবিয়ে। আমরা কুকুরটাকে ছাদে রেখেই সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নেমে এলাম।

নেমে এসেই দেখি আমাদের ঘরের পাশে মালীবুড়ো আর বিশু চুপচাপ বসে আছে।

স্বাতীদি বললেন, "এই তোমরা এখানে কেন ? যাও, নীচের ঘরে যাও। এখানে আমরা শোবো, হল্লা করব। সারারাত ঘুমোতে পারবে না তোমরা।"

আমি মালীবুড়োকে বললাম, "হ্যাঁ, স্বাতীদি ঠিকই বলেছেন। তোমরা নীচের ঘরেই যাও। নইলে আমাদের দাপাদাপিতে তোমরা অস্থির হয়ে উঠবে।"

তারপর বিশুকে বললাম, "কী রে ব্যাটা, কেমন বুঝছিস ?"

বিশু হেসে বলল, "আপনারা শহরের লোক। সাহস আছে আপনাদের।"

"যা, এবার নীচের ঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমোগে যা। ভয় পেলে ডাকিস।"

মালীবুড়ো হঠাৎ বলল, "জলসাঘরের দরজা খুলল কে ?"

"আমরা খুলেছি।"

"ওটা এখুনি বন্ধ করে দিন।"

স্বাতীদি বললেন, "থাক না খোলা। আজ রাত্রে আমরাই যদি এখানে গানবাজনা করি?"

মালীবুড়ো স্বাতীদির কথার উত্তর না নিয়ে বলল, "এই ঘর অভিশপ্ত। এ ঘরের দরজা খুলবেন না। কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে চলে যান এখান থেকে।" -

আমি বললাম, "না। আজ আর কোনও ঘরই বন্ধ নয়। সব ঘরের দরজাই খুলে দেব আমরা। এই বাড়ির অভিশাপ আজ আমরা কাটাবই।"

"আপনাদের এখানে থাকতে দেওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন করুন।" বলে মালীবুড়ো বিশুকে নিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে আমরা কেউ আর শোওয়ার ঘরে না ঢুকে জলসাঘরে ঢুকলাম।

বিমান রসিকতা করে বলল, "এই তা হলে জলসাঘর। এই ঘরেই একসময় নাচগানের ফোয়ারা ছুটত ? তা যারা সেসব করত তারা কোথায় লুকোলে বাবারা ? শোনাও না একটু তোমাদের গানবাজনা ?"

স্বাতীদি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক কথা। এই পোড়ো বাড়িতে, আমরা যাদের অতিথি হয়ে এসেছি তারা কেন আমাদের সঙ্গে এইরকম করছে? যা হোক শোনানো উচিত।"

প্রশান্ত বলল, "যদি অশরীরী কেউ থাকো এই বাড়িতে, তা হলে আমি এক-দুই-তিন বলছি। তিন বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সাড়া দেবে। নইলে জানব এখানে কেউ নেই। সব ভাঁওতা।" বলেই প্রশান্ত হাঁক দিল, "এক-দুই-তিন।"

কিন্তু না। কোনও সাড়াশব্দই কোথাও থেকে এল না। প্রশান্ত বলল, “তা হলে আমরাই শুরু করি। আজ রাতে জলসাঘর আবার ভরে উঠুক গানে গানে।"

একটা বাংলা সিনেমার গান দিয়ে শুরু হল। প্রথম লাইনটা প্রশান্ত ধরতেই সুরে সুর মিলিয়ে আমি কণ্ঠ দিলাম। তারপর বিমান। বিমানের দেখাদেখি স্বাতীদিও সুরেলা গলায় গান ধরল। অরুণবাবুও চুপ করে রইলেন না। সবকটা কণ্ঠ একত্রিত হয়ে জলসাঘর ভরিয়ে তুলল একেবারে।

গান শেষ হলে আমরা হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়লাম। রাত তখন একটা। প্রশান্ত বলল, “আর কি! এবার শুয়ে পড়া যাক।”

স্বাতীদি অবাক হয়ে বললেন, “ওমা, শোবে কী! শোওয়ার পরে যদি চুপি চুপি ভূতেরা আসে? আজ কোনও শোওয়া-টোয়া নয়। আজ শুধু রাত জেগে ভূতের জন্য অপেক্ষা করা | ”

বিমান বলল, “ঠিক। শুলেই গোলমাল। তার চেয়ে আমি বলি কি, স্বাতীদি, আপনি একটা গান ধরুন। খুব ভাল গলা আপনার।”

স্বাতীদি বললেন, “একা একা শুধু গলায় কি গান হয় ? বেশ হত যদি একটা হরমোনিয়াম থাকত। ”

অরুণবাবু বললেন, “এই তো, ঘরের কোণে একটা হারমোনিয়াম রয়েছে দেখছি।”

স্বাতীদি বললেন, “কবেকার পুরনো। ওতে আওয়াজ বেরোবে?” বলে হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে রিডগুলো টিপে দেখতেই সুরে সুরে ঘর ভরে গেল। হঠাৎ বিছে কামড়ালে যেমন হয় ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে উঠলেন স্বাতীদি, “এ কী এ কী! আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে কেন? আমার যেন কীরকম হচ্ছে। বড় কষ্ট হচ্ছে আমার।”

অরুণবাবু উঠে গিয়ে স্বাতীদিকে ধরলেন, "না না ও কিছু নয়। কী কষ্ট হচ্ছে? আসলে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছ। রাত জেগে হইহল্লা করছ।একটু শুয়ে থাকো, সব ঠিক হয়ে ;" কিন্তু বললেই কি হয়? স্বাতীদির গলা থেকে একটা চাপা আর্তস্বর বেরিয়ে এল, "আ-আ-আঃ।"

সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভে গেল। গোটা ঘর ভরে গেল অন্ধকারে। বাইরে চাপাগাছের ডালে একটা নিশাচর পাখি ডাকল। হঠাৎ ফুলের গন্ধে ভরা একঝলক মিষ্টি বাতাস বয়ে গেল আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে।

পরক্ষণেই আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর। কিন্তু এ কী ! এ কী দেখছি আমরা! দেখলাম জলসাঘরের মাঝখানে শলমা চুমকির পোশাক পরে রাজনর্তকীর সাজে সজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বাতীদি। আমাদের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসছেন। মাথার ওপর ঝাড়লন্ঠনের আলোর বন্যা বইছে। একপাশে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রাজপোশাক পরে সুরাপাত্র হাতে অরুণকুমার। যেন রুপোলি পর্দার কোনও ছায়াছবির দৃশ্য দেখছি আমরা। স্বাতীদি আমাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়েই পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে হাতে তাল দিলেন– তা থেই তা তা থেই। অমনই নেপথ্যে এক সুরেলা হারমোনিয়াম দ্রুত লয়ে বেজে উঠল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে ওস্তাদি গানের সঙ্গে জলদে উঠল তবলার লহরা। তারপর ত্রিতাল ঠেকার তালে তালে শুরু হল নাচের ঘূর্ণি।

আমরা বিস্মিত, বিমূঢ়, স্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নাচগানের মাঝখানে চেঁচিয়ে উঠলেন অরুণকুমার, "এ কী! তুমি! তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে ? বন্ধ করো এই গান। নাচ থামাও। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

স্বাতীদি বললেন, "না। শুনতেই হবে তোমাকে। আজ আমি সারারাত ধরে নাচব গাইব। আমাকে নাচতে দাও ! আমাকে গাইতে দাও।"

"খবরদার বলছি। আমার কথা অমান্য করার পরিণাম কি তা জানো ?"

"জানি। তুমি আমাকে গুলি করে মারবে, এই তো? মারো–মারো আমাকে। দেখব তোমার বন্দুকে কত গুলি আছে! এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই অরুণকুমার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দেওয়ালে আটকানো বন্দুকটা নিয়ে এসেই উঁচিয়ে ধরলেন স্বাতীদির দিকে।

আমরা চিৎকার করে উঠলাম, "আরে আরে! এ কী করছেন? আপনি কি সত্যি সত্যি গুলি করে মারবেন নাকি? অরুণবাবু!"

"সরে যাও। সরে যাও তোমরা। ওকে আমি শেষ করে দেব।" ততক্ষণে বন্দুকের গুলি ছুটে গেছে। স্বাতীদির বুক রক্তে ভেসে গেল। স্বাতীদি—আ-আ-আঃ করে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন।

বন্দুকের শব্দ শোনামাত্র ছাদের ওপর একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। হঠাৎ দেখা গেল কুকুরটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাতীদির ওপর। এ কী করে সম্ভব! এ তো সেই কুকুরটা। যেটাকে আমরা ছাদে রেখে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে নেমে এসেছি।

আবার গর্জে উঠল বন্দুক।

কুকুরটা আ-আ-আঁউ করে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে স্থির হয়ে গেল।

অরুণকুমার হঠাৎ স্বাতীদির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এ কী এ কী করলাম, আমি কি সত্যি মেরে ফেললাম তোমাকে? স্বাতী, তুমি কথা বলছ না কেন?"

এইসব চেঁচামেচি আর বন্দুকের শব্দ শুনে মালীবুড়ো ও বিশু ছুটে এসেছে ওপরে . বিবর্ণ মুখে দরজার একপাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মেঝেয় পড়ে থাকা রক্তাক্ত স্বাতীদির দিকে চেয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছে যেন।

অরুণকুমার চোখ লাল করে বললেন, "তোরা এখানে কেন। কী চাই তোদের, মজা দেখতে এসেছিস ?"

আতঙ্কে থমথম করছে ওদের মুখ। মালীবুড়ো কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "এ কী করলে দাদাবাবু! আপনি সত্যি সত্যি মেরে ফেললেন বউদিমণিকে ?"

"স্টপ ইয়োর ওয়ার্ড। ননসেন্স। তোদেরকেও আমি গুলি করে মারব। এই বাড়ির একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখব না আমি। যেমন করে স্বাতীকে মেরেছি, ঠিক সেইভাবেই তোদেরকেও মারব।"

মালীবুড়ো আর বিশু তখন চোখের পলকে ছুটে পালাল সেখান থেকে।

অরুণকুমার বন্দুক উচিয়ে তাড়া করলেন ওদের, "কোথায় পালাবি বাছাধন?"

আমরা বিস্মিত, বিমূঢ়। কী যে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না তার। তবুও আমরা ছুটলাম ওদের পিছু পিছু যে করেই হোক এই হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে।

বিমল বলল, "কী হচ্ছে অরুণবাবু? আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আপনি কি জানেন খেয়ালের বশে কী কাণ্ড করেছেন আপনি? আমরা সবাই যে একধার থেকে অ্যারেস্ট হয়ে যাব।"

অরুণকুমার তখন বারান্দার কাছে ছুটে গেছেন।

বিশু এক লাফে গেট পার হয়ে গেল। কিন্তু মালীবুড়ো পারল না। যেই না গেটের কাছে আসা অমনই ওপর থেকে শব্দ হল গুড়ুম। মালীবুড়োর দেহটা ছিটকে পড়ল একটা ম্যাগনোলিয়া গাছের কাছে। কে জানে হয়তো এই গাছটা মালীবুড়েই একদিন যত্ন করে বসিয়েছিল নিজের হাতে।

অরুণকুমার এবার তরতরিয়ে সিড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। আমরাও নামলাম ওঁর পিছু পছু।

অরুণকুমার গেট পেরিয়ে ছুটে চললেন ঝাউবনের দিকে।

আমরাও ছুটছি।

ওই তো বিশু, সেও ছুটছে প্রাণের দায়ে।

ওকে বাঁচাতেই হবে।

অরুনকুমারের বন্দুক আবার গর্জে উঠল।

অসহায় বিশুর কাতর আর্তনাদ শোনা গেল--আ-আ-আ।

অরুনবাবু ছুটে বিশুর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে একবার দেখলেন ওকে। তারপর ওর বুকে একটা পা রেখে অল্প একটু চাপ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন,“শেস হয়ে গেছে। আর একটিমাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে। সেটা আমি নিজের জন্য রাখলাম।

আপনারা ছেলেমানুষ। তার ওপর আমাদের অতিথি। সেইজন্যই কিছু বললাম না। তবে ভবিষ্যতে এই বাড়িতে আর কখনও রাত্রিবাস করবার চেষ্টা করবেন না। যান চলে যান।”

আমরা অতিকষ্টে সেখানে থেকে পালিয়ে বাঁচলাম। ভেঅরবেলা গ্রামে পৌঁছে শুনলাম গতকাল আমরা বিশু, মালীবুড়ো, স্বাতীলেখা ও অরুনকুমার নামে যাদের দেখেছি তারা কেউ জীবিত নয়। ১৯৩০ সালের এক ভয়ঙ্কর রাতে কী এক অজ্ঞাত কারণে ওরা নাকি ওইভাবেই মারা গিয়েছিল।

সুতোরস্ত

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ছোটবেলা থেকেই আনিস একটু পাগলা গোছের। সে প্রথমবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বার বছর বয়সে নিজেই ফিরে এসেছিল সপ্তাহখানেক পরে । চাচার বাড়িতে মানুষ, চাচা-চাচি মিলে তখন গরুর মতো পেটালেন তাকে । আমরা ভাবলাম শিক্ষা হয়েছে, আর পালাবে না। কোথায়কী ছয় মাসের মাথায় আবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, ফিরে এলে আবার চাচা-চাচি মিলে পালা করে পেটালেন তাকে ।

মার খেয়ে আনিস বিশেষ কান্নাকাটি করত না। শরীরটা নরম করে রাখলে নাকি মার খেলে ব্যথা লাগে না। তা ছাড়া সে নাকি এক পাগলা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে "কুফুরি কালাম" শিখে এসেছে। দুচোখ বন্ধ করে একবার সেই কুফুরি কালাম পড়ে নিলে সব যন্ত্রণা নাকি বাতাসের মতো উবে যায়। দশ টাকা দিলে আমাকে সব শিখিয়ে দেবে বলেছিল। ছেলেবেলায় পুরো দশ টাকা একসাথে কখনো জোগাড় করতে পারিনি বলে সেই অমূল্য মন্ত্র আমার আর শেখা হয় নি।

আনিস বাড়ি থেকে পালিয়ে বিচিত্র সব জায়গায় যেত। কোন ভাঙা মন্দিরে নাঙ্গা সন্ন্যাসী থাকে, কোন পুকুরে জ্যোৎস্না রাতে পরী নেমে আসে, কোন শ্মশানে পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক থাকে। এইসব খোঁজখবর তার নখদর্পণে ছিল। কারো সাথে কথাবার্তা বেশি বলত না। আমার মনটা একটু নরম ছিল বলে চাচা-চাচি মিলে তাকে পিটিয়ে যখন আধমরা করে রাখত, আমি একটু সেবাশুশ্রুষা করতাম, সে জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে সে একটা-দুটো মনের কথা বলত।

সেই আনিসের সাথে আমার দেখা হল প্রায় কুড়ি বছর পরে। কমলাপুর স্টেশনে চশমা পর একজন মানুষ আমার কাছে এসে বলল, ইকবাল না ।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি?

আমি আনিস। মনে আছে চাচা মেরে একদিন রক্ত বের করে দিল। তুই দূর্বাচিবিয়ে লাগিয়ে দিলি।ইনফেকশান হয়ে গেল তখন—

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, পাগলা আনিস!

হ্যাঁ। আনিস ভুরু কুঁচকে বলল, দারোয়ানদের মতো গোফ রেখেছিস দেখি।

আমি হেসে বললাম, ছাত্র পড়াতে হয়, গোফ না থাকলে চেহারায় গাম্ভীর্য আসে না। তোর কি খবর?

দাঁড়া, বলছি। যাবি না কিন্তু খবরদার! আমি একটা কাজ সেরে আসি ।

আমাকে দাড় করিয়ে আনিস চলে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। এসে বলল, বিষ্যুৎবার করে গৌরীপুর থেকে এই লোকটা আসে। কতদিন থেকে ধরার চেষ্টা করছি—

কি রকম লোক?

ব্ল্যাক আর্টিস্ট। শয়তানের উপাসক। আমি মাথা নেড়ে বললাম, তুই এখনো তন্ত্রমন্ত্র করে বেড়াচ্ছিস?

কেন করব না ? চাচাও নেই যে ধরে পেটাবে! এখনই তো সময়।

আশ্চর্য ব্যাপার!

আশ্চর্যের কী আছে? কাজ না থাকলে চল আমার বাসায়।

কাজ ছিল বলে সেদিন যেতে পারিনি। পরের সপ্তাহেই গিয়েছি। আনিস হতচ্ছাড়া ধরনের মানুষ ছিল। ধারণা ছিল কোনোদিনই গুছিয়ে উঠতে পারবে না। দেখলাম বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। জহুরির কাজ করে। মূল্যবান পাথর দেখে তার মান বিচার করে । এদেশে এর কদর নেই, বিদেশ থেকে কিছু কিছু মানুষ

মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। মোট টাকা দেয় তারা-সেটাতেই তার বেশ চলে যায়।

আনিসের বাসাটা যেরকম হবে ভেবেছিলাম গিয়ে দেখি ঠিক সেরকম। দিনে কী রকম হয় জানি না রাতে সেটা সবসময়েই আধো অন্ধকার। বেশি উজ্জ্বল বাতি নাকি আনিসের ভালো লাগে না। আনিসের সারা বাসা জুড়ে শুধু নানা আকারের আলমারি আর সেলফ। তার মাঝে নানা আকারের বোতল, বয়াম, শিশি আর বাক্স। তার ভিতরে নানারকম জিনিস। বিদঘুটে প্রাণীর ফসিল,হাড়গোড়,পাথর, প্রাচীন ব্যবহারী জিনিস, পুরনো বই, ছবি--কী নেই!

আনিসের সাথে নানারকম কথাবার্তা হল । পুরেনো বন্ধুরা এখন কে কোথায় আছে কী করে সেটা নিয়ে কথা বলে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিলাম। চলে আসার আগে তার আজগুবি শখ নিয়ে কথা উঠল, বললাম, বাসা দেখি দুনিয়ার হাবিজাবি জিনিসে ভরে রেখেছিস ।

আনিস হেসে বলল, ঠিকই বলেছিস!

কী করবি এগুলো দিয়ে ?

কিছু একটা করতেই হবে? এমনি রেখেছি। শখ।

তোর সবকিছুই আজগুবি ! আজগুবি তুই দেখিস নি—তাই এগুলোকে বলছিস আজগুবি।

গল্পের সন্ধান পেয়ে আমি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তুই দেখেছিস নাকি?

সারা জীবন কাটিয়ে দিলাম এর পিছনে, আমি দেখব না তো কে দেখবে?

কী দেখেছিস?

দেখবি ?

দেখা।

আনিস উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা ছোট কালো কাঠের বাক্স নিয়ে এল। আমার কাছে বসে সাবধানে বাক্স খুলে তামার একটা চৌকোন জিনিস বের করে আমার হাতে দিল। বলল, এটা দেখ। খুব সাবধান, নিচে ফেলবি না।

কী এটা ?

এক তান্ত্রিক সাধু আমাকে বিশেষ স্নেহ করত। সে মরার আগে আমাকে দিয়ে গেছে।

কিন্তু জিনিসটা কী?

বলতে পারিস এক রকমের তাবিজ। হাতের মাংস কেটে শরীরের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছিল সে। মরার আগে কেটে বের করে দিয়ে গেছে।

শুনে ঘেন্নায় আমার শরীর একটু ঘিনখিন করে উঠল। জিনিসটা বাক্সে রেখে বললাম, কী হয় এটা দিয়ে?

হাতের মুঠোর ভিতরে শক্ত করে চেপে ধরে বলবি—সুতোরস্তু।

কী হবে তা হলে ?

বলে দেখ।

আমি জিনিসটা হাতে নিয়ে শক্ত করে মুঠো চেপে বললাম, কী বলব এখন?

সুতোরস্তু। ধরে রাখবি এটা, ছড়বি না।

আমি ধরে রেখে বললাম, সুতোরস্তু। আর কী আশ্চর্য, মনে হল জিনিসটা যেন নড়ে উঠল হতের ভিতর!

আনিস বলল, ধরে রাখ, ছাড়িস না।

কেন? কী হবে?

দেখবি নিজেই।

আমি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করলাম মুঠোর ভিতরে জিনিসটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে!

কিছু টের পাচ্ছিস ?

হ্যা। মনে হচ্ছে গরম হচ্ছে জিনিসটা মনে হচ্ছে একটু একটু নড়ছে।

আনিস একটু হেসে বলল, আরেকবার বল সুতোরস্তু, দেখবি আরো গরম হবে।

আমি বললাম, সুতোরস্তু। কী মনে হল, কয়েকবার বললাম কথাটি— সুতোরস্তু সুতোরস্তু সুতোরস্তু-আর সাথে সাথে মনে হল হাতের মুঠোয় আমার চাকতিটি গনগনে গরম হয়ে কিলবিল করে নড়ছে। চিৎকার করে হাত থেকে ফেলে দিলাম জিনিসটা।

আনিস লাফিয়ে উঠে হাহা করে বলল, কী সর্বনাশ! কী সর্ব্বনাশ! কী করলি এটা ? কী করলি ?

কেন, কী হয়েছে?

ঠিক হল না এটা। আনিস গম্ভীর হয়ে বলল, একেবারেই ঠিক হল না। তোকে বললাম আর একবার বলতে, তুই এতবার বললি কেন?

কেন, কী হয়েছে?

এটা একবার হাতের মুঠোয় নিয়ে সুতোরস্তু বলার পর নিচে রাখার একটা নিয়ম আছে। কখনো হাত থেকে ফেলে দিতে হয় না।

কী হয় ফেলে দিলে ?

তুই বুঝতে পারছিস না। এটা একটা সাংঘাতিক জিনিস । হাতে নিয়ে তুই যখন বলেছিস সুতোরস্তু তখন তুই একটা ব্যাপার শুরু করেছিস ।

কী ব্যাপার?

তোকে বোঝানো মুশকিল। আনিস খুব গম্ভীর হয়ে বলল, তান্ত্রিক সাধুরা দীর্ঘদিন সাধনা করে নানারকম অপদেবতা বশ করে । সেই সব অপদেবতারা তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তান্ত্রিকদের সাথে থাকে, তাদের আদেশ মেনে চলে। তুই

সেরকম একটা অপদেবতাকে ডেকেছিস। সে আসছে। তাকে ফিরিয়ে দেয়া যেত কিন্তু তুই জিনিসটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিস, এখন আর তাকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

আবছা অন্ধকার, বিচিত্র সব জিনিসপত্র চারদিকে, আনিসের থমথমে গলার স্বর,আমি আরেকটু হলে তার কথা প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠলাম, বললাম, বলছিস এটা আলাদীনের চেরাগ ? ঘষে দিলেই দৈত্য চলে আসে?

আনিস একটু আহত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না?

না ।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আনিস বলল, সূতোরস্তু আসবে। ইকবাল, তোর ওপর বড় বিপদ।

সুতোরস্তু কি দৈত্যটার নাম?

ঠাট্টা করিস না। সূতোরস্তু ঠিক নাম নয়, বলতে পারিস গোত্র। সে আসছে। তোর ওপর খুব বিপদ--

ভালো। আমি হেসে বললাম, বিপদ-আপদ আমার ভালোই লাগে।

আনিস একটু অধৈর্য হয়ে বলল, তুই এখন থেকে আমার সাথে থাকবি ।

তোর সাথে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

তুই জানিস না এখন কী করতে হবে। আমি জানি? সুতোরস্তু কিছু একটা নিয়ে যাবে, তুই বুঝতে পারছিস না।

কবে আসবে সূতোরস্তু?

জানি না। আজো আসতে পারে, দু সপ্তাহ পরেও আসতে পারে ;

আর যতদিন না আসছে আমার সব কাজকর্ম ফেলে তোর বাসায় থাকতে হবে?

হ্যাঁ। আনিস, তোর বাসায় থাকতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। আমি এসে থাকব কিছুদিন, কিন্তু এখন নয়। তুই সুতোরস্তকে আসতে দে, আমি একাই ম্যানেজ করব। ভালো করে চা নাস্তা খাইয়ে দেব।

ইকবাল—আনিস থমথমে গলায় বলল, এটা ঠাট্টার জিনিস না। তোর আমার কথা শুনতে হবে । তোকে এখন থেকে আমার সাথে থাকতে হবে।

সম্ভব না। আমার অনেক কাজ।

আনিস অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, তোর এখন আমার কথা শুনতেই হবে। যা যা বলি শোন। তোর কিংবা অন্য কোনো একজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে এর উপর। আনিস যা বলল তার সারমর্ম এই পৃথিবীতে যেরকম মানুষ এবং নানারকম জীবজন্তু রয়েছে, তেমনি পরকালের জগতেও মানুষের সমজাতীয় প্রাণী এবং জন্তু-জানোয়ারের সমজাতীয় বিদেহী শক্তি রয়েছে। তান্ত্রিক সাধু বা নানারকমের সাধকেরা সাধনা করে পরজগতের এইসব প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করেন। সেইসব প্রাণীদের বুদ্ধিমত্তা বেশি হলে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা যায়। নিচ জাতীয় প্রাণী হলে তাদের জোর করে বশে রাখতে হয়। সুতোরস্তু নিচ জাতীয় একটা ভয়ংকর প্রাণী। তাকে জোর করে বশ করে রাখা হয়েছে। সাধকেরা শক্তি পরীক্ষা করার জন্যে এদের বশ করে রাখেন। সুতোরস্তু নামের বিদেহী যুক্তিতর্কহীন এই প্রাণীটি অত্যন্তশক্তিশালী,তাকে ভুল করে আহ্বান করা হয়েছে। আহ্বান করা হলে তাকে আসতে হয়—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না হলে সে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে যায়। যে তান্তিক মারা গিয়েছে সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, আর কেউ পারবে সেইরকম কোন নিশ্চয়তা নেই।

আনিস অত্যন্ত জোর দিয়ে কথাগুলো বলেছিল বলে চুপ করে আমি শুনে গেলাম। কিন্তু তার কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। কথা শেষ হলে বললাম, ধরা যাক তোর সব কথা সত্যি। তোর সুতোরস্তু ভয়ংকর শক্তিশালী একটা বিদেহী প্রাণী। কিন্তু সে মানুষের জগতে বাস করে না, কাজেই মানুষের জগতে সে কিছুই করতে পারবে না।

আনিস মাথা নেড়ে বলল, তোর কথা খানিকটা সত্যি, কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। সাধক মানুষেরা যেরকম তাদের জগতে যোগাযোগ করতে পারে, এরাও খানিকটা পারে। এদের যোগাযোগটা হয় ভয়ংকর। মানুষ ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে গেলেই ওরা পুরোপুরি সর্বনাশ করতে পারে।

আমি বললাম, আমি ভয় পাই না। ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই, তাই ভয়ও নেই। বাজি ধরে আমি লাশকাটা ঘরের টেবিলে বিছানা করে ঘুমিয়েছি।

আনিস খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যিই যদি তুই ভয় না পাস, তোকে সুতোরস্তু কিছু করতে পারবে না। মানুষ থেকে শক্তিশালী কোনো প্রাণী নেই। তবে তোকে দুটি কাজ করতে হবে।

কী ?

প্রথমত আগামী দু সপ্তাহের ভিতরে যদি তুই কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করিস, তোকে সাবধান হতে হবে।

কী রকম ?

সবসময় তোর সাথে একটা জীবিত প্রাণী রাখবি।

কেন ? এরা যখন আসে সবসময়ে কোনো একটা কিছুর প্রাণ নিয়ে যায়। চেষ্টা করে মানুষের নিতে, না পারলে অন্য কিছুর। ঘরে খাচায় একটা পাখি রাখা সবচেয়ে সহজ।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, আমার ঘরে অনেক মশা আছে দেয়ালে টিকটিকি---

আনিস হাসার ভঙ্গি করে বলল, সুতোরস্তু যখন এসে হাজির হবে তুই বেশ অবাক হয়ে লক্ষ করবি আশপাশে কোনো প্রাণী থাকবে না। কীটপতঙ্গ পশুপাখি কোনো কোনো ব্যাপারে মানুষ থেকে অনেক বেশি বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে---

কী?

হাত বাড়িয়ে দে।

আমি ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দিলাম। অনিস একটা ছোট শিশি থেকে কী যেন একটা তরল পদার্থ নিয়ে হাতের পিঠে লম্বা কী একটা দাগ দিয়ে দিল ।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, এটা কী?

একটা কেমিক্যাল । তোর হাতের উল্টোপিঠে একটা চিহ্ন একে দিলাম। কাল, পরশু এটা স্পষ্ট হবে উল্কির মতো--তবে ভয় নেই, সারা জীবন থাকবে না। মাসখানেকের মধ্যেই মুছে যাবে।

কী হবে এটা দিয়ে ?

যদি কখনো কিছু দেখে খুব ভয় পাস, এই চিহ্নটা বুকের কাছে ধরবি, দেখিস, ভয় চলে যাবে। একটা শক্তি পাবি।

আমি তাবিজ-কবজ বিশ্বাস করি না !

না করিস তো ভালো, সেই জন্যে চামড়ার উপর পাকাপাকিভাবে করে দিলাম। আজ কাল হাত একটু জ্বালা করতে পারে, ইনফেকশন হবার কথা নয়। যদি হয় এন্টিবায়োটিক খেয়ে নিবি ।

আমি ওঠার সময় বললাম, দাখ আনিস, ভূতপ্রেত আছে কি নেই সেটা নিয়ে আমি তোর সাথে তর্ক করতে চাই না। থাকলে থাকুক, আমি তাদের ছাড়াই জীবন কাটিয়ে এসেছি,বাকিটা তাদের ছাড়াই কাটিয়ে দেব।

আনিস বলল, চমৎকার! এই হচ্ছে বাপের ব্যাটা! রিকশা করে বাসায় আসার সময় আমি পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম। ভয়াবহ সুতোরস্তু এসে আমাকে সত্যি খুন করে রেখে যাবে কিনা সে নিয়ে আমার ভিতরে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। যে জিনিসটা আমাকে অবাক করেছে,সেটা হচ্ছে তামার মাদুলিটা, সেটার হঠাৎ করে গরম হয়ে যাওয়াটা। এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করি? আনিস হয়তো আমাকে সম্মোহন করেছে তা হলে গরম লাগাটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু হাতের তালুতে পোড়া দাগটা? সম্মোহন করে মানুষের হাতের তালুতে গরম অনুভূতি দেয়া যেতে পারে কিন্তু পোড়াবে কেমন করে?

ব্যাপারটা আমি ভুলেই যেতাম,কিন্তু ভুলতে পারলামনা হাতের উল্টেপিঠে আনিসের এঁকে দেয়া চিহ্নটির জন্যে। চিহ্নটি আস্তে আস্তে ফুটে উঠল। যখনই হাত দিয়ে কিছু করি, সেটা ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিযে থাকে। পরিচিত বন্ধুবান্ধবও বেশ অবাক হল, এই বয়সে হাতের পিঠে ছবি একে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলাও সহজ নয়।

এভাবে সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে। সম্ভবত সুতোরস্তু এসে ঘুরে গেছে,আমি টের পাইনি। হাতের চিহ্নটিও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি আনিসকে বেশ জোর গলাতেই বলেছিলাম যে ভূতপ্রেত আমি বিশ্বাস করি না, তবু কয়দিন ভিতরে ভিতরে একটু সতর্কই ছিলাম। কে জানে কিছু তো আর বলা যায় না।

এর মাঝে আমার ছোট খালার বিয়ে উপলক্ষে বাসার সবাই দল বেঁধে নেত্রকোন চলে গেল। রয়ে গেলাম আমি এবং জিতু মিয়া। জিতু মিয়া কাজের ছেলেটি, বয়স দশের কাছাকাছি। মহা ধুরন্ধর ব্যক্তি, সুযোগ পেলে জাতীয়

পরিষদের মেম্বার হয়ে যাবে সেটা আমি লিখে দিতে পারি। সেদিন সন্ধেবেলাবাসায় ফিরতেই জিতু মিয়া একগাল হেসে বলল, বাই, আফনে লাটকের চান্দা দেন নাই মনে আছে?

বাই মানে ভাই, লাটক মানে নাটক-আমার একটু চিন্তা করে বের করতে হল। কিছুদিন আগে গুণ্ডা ধরনের কিছু ছেলে নাটক করবে বলে চাঁদা চাইতে এসেছিল। অপরিচিত ছেলে, তাই কী নাটক, কোথায় হবে, কে পরিচালনা করবে এসব নিয়ে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। তখন একজন গরম হয়ে গেল বলে পুরো দলটাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছিলাম। বাসার সবার ধারণা কাজটা সুবিবেচনার হয় নি। আমি একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? কী হয়েছে?

আফনের গরে গিয়া দেহেন বাংলায় অনুবাদ করলে যার অর্থ—আপনার ঘরে গিয়ে দেখেন।

আমি আমার ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঘরের দেয়ালে মৃত প্রাণীর নাড়িভুঁড়ি ছুড়ে ছুড়ে মেরেছে। কিছু এখনো দেয়ালে লেগে আছে,কিছু দেয়াল থেকে খুলে নিচে পড়েছে। দেয়ালে বীভৎস রং, ঘরের ভিতর উৎকট দুর্গন্ধ। আমি রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। হাতের কাছে জিতুকে পেয়ে তাকেই দু-এক ঘা লাগানোর জন্যে হুঙ্কার দিয়ে বললাম, জানালা খুলে রেখেছিলি কেন?

খুলি নাই বাই! খোদার কসম । তা হলে ?

জানালা বন্ধ থাকা অবস্থায় কেমন করে দেয়ালে এগুলি ছুড়ে মারা যায় সেটা নিয়ে জিতু মিয়াকে ভাবিত দেখা গেল না। থাটি রাজনীতিবিদদের মতো সে সমস্যার সামনাসামনি এলে মস্তিষ্ক সুইচ টিপে বন্ধ করে দেয়।

একজন লোক ডাকিয়ে সময় লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করা হল। আজকালকার ছেলেরা এরকম নোংরা কাজ করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

রাতে খেতে বসার পর জিতু মিয়া আমাকে দ্বিতীয় খবরটি দিল। বলল, আম্মার মশা মারণের ওষুধ একেবারে
ফাস কেলাশ।

মা মশা মারার ওষুধ কিনেছেন সেটা মশাদের বিরুদ্ধে খুব কার্যকর শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। যেটা মশার জন্যে বিষাক্ত সেটা মানুষের জন্যেও বিষাক্ত। বিদেশে যেসব কীটনাশক ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে দেয়া হয়েছে, সেগুলো রুটিনমাফিক এ দেশে পাঠানো হয়। আমি জিতু মিয়াকে বললাম, নিয়ে আয় তো মশা মারার ওষুধটা। সাবধানে ধরবি।

জিতু মিয়া স্টোর রুম থেকে ফিনাইলের একটা কৌট নিয়ে এল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা মশা মারার ওষুধ ?

জ্বে

এটা দিয়ে মশা মারা হচ্ছে?

জ্বে। বাসায় কুনো মশা নাই।

কোনো মশা নেই?

না বাই।

আমার বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠল। আনিস বলেছিল, সুতোরস্তু যখন আসবে তখন বাসায় কোনো কীটপতঙ্গ পশুপাখি থাকবে না।

আমি দেয়ালের দিকে তাকালাম ; লাইটের কাছে একটা পুরুষ্ট টিকটিকি পোকা ধরে খায়। আজ পোকাও নেই, কোনো টিকটিকিও নেই। আলমারির কোনায় মাকড়সার জালে কিছু নিরীহ মাকড়সা থাকে, সেখানেও কিছু নেই। আমি জিতুকে বললাম,জিতু,স্টোররুমে কি তেলাপোকা আছে ?

তেউল্যাচুরা?

হাঁ।

আছে বাই। ক্যান ?

একটা ধরে আনতে পারবি?

মনের মতো একটা কাজ পেয়ে জিতু মিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কী বলেন বাই! পারুম না ক্যান!

জ্যান্ত ধরে আনতে হবে কিন্তু ।

দীর্ঘ সময় জিতু মিয়া স্টোররুমে জিনিসপত্র টানাটানি করে মুখ কালো করে ফিরে এল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, স্টোররুম অাঁতিাঁতি করে খুঁজেও সে কোনো তেলাপোকা পায় নি। আমিও ঘরের আনাচেকানাচে খুঁজে দেখেছি কোনো ধরনের পোকামাকড় কীটপতঙ্গ কিছু নেই। সব যেন ম্যাজিকের মতো উবে গেছে। তবে কি আনিসের কথাই সত্যি? সুতোরস্তু আসছে আজ রাতে? একটা প্রাণ নিয়ে যাবে? আমার? জিতুর ?

আমার সারা শরীর কাটা দিয়ে উঠল হঠাৎ।

রাত এগারটায় আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকেই আমি চমকে উঠি । দোয়ালে ছোপ ছোপ রক্ত কোথা থেকে এল? সারা ঘরে বাসি রক্তের একটা বোঁটক গন্ধ। শুধু তাই নয়, ঘরের ভিতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা, শরীর শিউরে ওঠে। আমি ঘরের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন ইলেকট্রিসিটি চলে যায় যায় করে ফিরে আসে, তখন এরকম হয়। কিন্তু আজ পরিষ্কার আকাশ! যদি ইলেকট্রিসিটি সত্যি চলে যায়, তখন কী হবে? বাসায় কোথায় যেন একটা টর্চলাইট আছে, সেটা এখন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ বাসায় কোনো জিনিসপত্র ঠিক জায়গায় রাখা হয় না, দরকারের সময় জিনিস খুঁজে পাওয়ার ঘটনা এ বাসাতে এখনো ঘটে নি। সিগারেট খাই বলে পকেটে ম্যাচ থাকে। এখন সেটাই একমাত্র ভরসা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আমি হঠাৎ শুনলাম শো-শোঁ করে বাতাসের শব্দ হল, তারপর হঠাৎ সবগুলি জানাল দড়াম করে খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ানক চমকে উঠলাম আমি—আর জীবনে প্রথমবার ভয় পেলাম। মনে হল আমার পিছনে ভয়াবহ কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কণ্ঠনালি ছিঁড়ে নেবে।

তা হলে সত্যিই সুতোরস্ত আসছে? আমি বসার ঘরে এসে দেখি সেখানে জিতু মিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কেমন জানি বিভ্রান্ত। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে জিতু?

বাই, বাসাড়া কাফে ক্যান?

কাঁপে?

জে বাই, কাফে। আমার কেমুন জানি ডর করে বাই।

তাহলে আমি এক নই, জিতুও ব্যাপারটা টের পেয়েছে। কিছু একটা হচ্ছে এই বাসায়। আনিসের কথা মনে পড়ল, সুতোরস্ত এসে একটা প্রাণ নিয়ে যাবে। সত্যি?

আমি মানিবাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে জিতুর হাতে ধরিয়ে বললাম, টাকাটা সাথে রাখ। আজ রাতে তুই বাসায় আসবি না।

জিতু অবাক হয়ে বলল, কই যামু তাইলে? জানি না, যেখানে ইচ্ছা, কিন্তু এই বাসায় না। যা, বের হ। এক্ষুণি বের হ! মনে রাখিস কাল সকালের আগে বাসায় ঢুকবি না।

জিতু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু না বলে বের হয়ে গেল।

আমি দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে দেখলাম খাবারের টেবিলের উপর একটা কাক মরে পড়ে আছে। আমার হঠাৎ গা গুলিয়ে বমি এসে গেল। আমি আস্তে

আস্তে অনেকটা নিজের মনেই বললাম, ঠিক আছে সুতোরস্তু, তুমি এস। দেখি তুমি কী করতে চাও।

স্টোররুমে একটা শাবল থাকে, সেটা খুঁজে বের করে আনলাম। অশরীরী প্রাণীর সাথে এটা কী কাজে লাগবে জানি না, কিন্তু একেবারে খালি হাতে কীভাবে কারো সাথে মুখোমুখি হই? বাসার আলো নিভুনিভু করছে, টর্চলাইটটা পেলে ভালো হত কিন্তু খুঁজে পেলাম না। ড্রয়ারে একটা বড় মোমবাতি পাওয়া গেল, পকেটে দেশলাই রয়েছে, সেটাই ভরসা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় বারটা, এই কালরাত কি কখনো শেষ হবে ?

আমি বসার ঘরে দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটে দুটো টান দিয়েই স্নায়ু একটু শীতল হল। কী আশ্চর্য! এই বিংশ শতাব্দীতে বসে আমাকে সত্যিই অপদেবতা দেখতে হবে?

সিগারেট খেতে খেতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা বিচিত্র জিনিস ঘটতে শুরু করল। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আবছা আবছা একটা প্রাণীর রূপ নিতে শুরু করে। সত্যি দেখছি না চোখের ভুল? আমি ফুঁ দিতেই প্রাণীটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু সাথে সাথে ঝনঝন শব্দ করে দেয়াল থেকে ফ্রেমে ঝোলানো একটা জলরঙের ছবি খুলে পড়ল, কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, হঠাৎ মনে হতে লাগল আমি ছাড়াও ঘরে আরো কেউ আছে! ভয়ানক কিছু একটা আছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে, অনেক কষ্ট করে আমি নিজেকে শান্ত করে রাখলাম, দেখা যাক কী হয়। আমি চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে আস্তে আস্তে কিন্তু জোর দিয়ে বললাম, সুতোরস্তু,তুমি যাও। তুমি চলে যাও ।

নিজের কাছে নিজের কণ্ঠস্বরটি শোনাল ভারি অদ্ভূত। আর সাথে সাথে বাসা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। টেবিল পেয়ালা, পিরিচ, টেবিল ল্যাম্প, ঘরের শেকল ঝনঝন শব্দ করে কেঁপে উঠল, আমি দেখলাম লাইটটা ডান থেকে বামে ঝুলতে শুরু করেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সেটা শব্দ করে ফেটে গেল, সাথে সাথে সারা বাসা অন্ধকার হয়ে গেল। ফিউজ কেটে গেছে নিশ্চয়ই।

হা-হা-হা শব্দ করে সারা ঘরে কী যেন একটা ছুটে গেল, একটা গরম বাতাসের হলকা টের পেলাম আমি। পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালালাম কাঁপা হাতে, ঘরের অন্ধকার দূর না হয়ে যেন আরো বেড়ে গেল । আমি আবছা দেখতে পেলাম ঘরের এক কোনায় মেঝেতে গুড়ি মেরে কী যেন বসে আছে। মনে হল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঝাঁপিয়ে কি পড়বে আমার উপর? আমি সাবধানে মোমবাতিটা জ্বালালাম, দপদপ করে শিখা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল নিভে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। আমি মোমবাতিটা শক্ত করে ধরে রেখে ঘরের কোনায় তাকালাম, সত্যি কি কিছু আছে? কিছু দেখা গেল না।

ঠকঠক করে দরজায় শব্দ হল হঠাৎ। আমি চমকে উঠলাম, পর মুহূর্তে শুনলাম জিতুর গলার স্বর। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাই, বাই গো, ও বাই

আমি ভয় পেয়ে দরজা খুলতে খুলতে বললাম, কী হয়েছে জিতু ?

আমার ট্যাহ!—

দজা খুলতেই জিতু হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে বলল, আমার ট্যাহা দেয় না—

হঠাৎ করে জিতু চুপ করে গেল। আমি ভয় পেয়ে তাকলাম, জিতু---

জিতু কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকাল। মোমবাতির আলোতে হঠাৎ বিচিত্র দেখাল জিতুকে। চোখ দুটিতে আতঙ্ক, রক্তহীন মুখে যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। আমি বললাম, কী হয়েছে জিতু ? কী হয়েছে?

জিতু উদভ্রান্তের মতো একবার চারদিকে তাকাল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু বলতে পারল না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার বুকটা ধক করে উঠল। মোমবাতির শিখাটা দপ দপ করে হঠাৎ নিভে গেল আর আমি শুনলাম একটা প্রাণফাটানো আর্তচিৎকার।

আমি শক্ত করে জিতুকে আঁকড়ে ধরি, জিতু থরথর করে কাঁপছে, তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

জিতু—আমি চিৎকার করে ডাকলাম, জিতু—কী হয়েছে তোর ?

জিতু কোনো উত্তর দেয় না। থরথর করে কাঁপতে কঁপতে অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো শব্দ করতে থাকে। মনে হয় যেন সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

আমার হঠাৎ আনিসের কথা মনে পড়ল। বলেছিল সুতোরস্ত একজনের প্রাণ নিয়ে যাবে। তা হলে জিতুই কি সেই একজন ?

ঠিক তখন আমার মনে পড়ল আমার হাতের চিহ্নটার কথা। আনিস বলেছিল হাতটা বুকের কাছে ধরে রাখতে, ভয় চলে যাবে তা হলে? আমি জিতুকে শক্ত করে চেপে ধরে হাতটা জিতুর বুকের উপর চেপে ধরলাম, ফিসফিস করে জিতুর কানের কাছে বললাম, জিতু, কোনো ভয় নেই---

বলার সাথে সাথে সত্যি সত্যি আমার ভিতর কেমন জানি সাহস ফিরে এল ; সত্যি মনে হতে থাকলো কোনো ভয় নেই। জিতুকে আঁকড়ে ধরে আবার বললাম, আমি আছি—কোনো ভয় নেই তোর।

ঘরের ভেতর গরম বাতাসের একটা হলকা খেলে গেল একবার। দরজা—জানাল সব খুলে গেল, তারপর হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল ।

আমি চিৎকার করে বললাম, থাম।

ঝনঝন করে কী একটা যেন ভেঙে পড়ল। আমি নিঃশ্বাস নিয়ে আবার চিৎকার করে বললাম, দূর হয়ে যাও এক্ষুণি ।

কী একটা যেন আছড়ে পড়ল ঘরের মাঝে। জমাট বাধা একটা অন্ধকার হঠাৎ যেন ছুটে আসতে শুরু করে আমার দিকে। আমি জিতুকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, খবরদার---

আর কী আশ্চর্য—সেটা যেন থেমে গেল। আশ্চর্য একটা শক্তি অনুভব করলাম আমি নিজের ভিতরে। প্রথমবার আমার মনে হল এই অশরীরী শক্তি আমাকে কিছু করতে পারবে না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললাম, যাও তুমি। দূর হয়ে যাও--

হঠাৎ করে মন হল সুতোরস্তু সত্যিই চলে গেছে, কোনো ভয় নেই আর ।

আমি তবু চুপচাপ বসে রইলাম। ঘরে আর কোনো শব্দ নেই, সুনসান নীরবতা।

জিতু আস্তে আস্তে বলল, বাই ভর করে। আমি জিতুকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম, ভয় কী জিতু? আমি আছি না?

জিতু হঠাৎ ফ্যাচফাচ করে কাঁদতে শুরু করল। আমি তাকে কাঁদতে দিলাম--বেচারা বড় ভয় পেয়েছে।

হঠাৎ শুনিকানের ভিতর একটা মশাগুনগুন করছে। খোলা জানাল দিয়ে মশা ঢুকেছে ভিতরে মশার শব্দে আমি জীবনে আর কখনো এত আনন্দ পাই নি। জিতুকে নামিয়ে বললাম, আর কোনো ভয় নেই জিতু। আয় বাতি জ্বালাই এবার।

আনিস সব শুনে বলল, তোকে বলেছিলাম মনে আছে, মানুষের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই? দেখলি তো?

আমি বললাম,কিন্তু শেষ মুহূর্তে তোর এই চিহ্নটার কথা মনে না পড়লে কী হত কে জানে। যেই বুকের কাছে ধরলাম সাথে সাথে—

আনিস হঠাৎ হো-হো করে হাসতে শুরু করে। আমি থতমত খেয়ে বললাম, কী হল, হাসছিস কেন?

এই চিহ্নটার অলৌকিক শক্তির কথা শুনে।

কেন ?

তুই কি ভেবেছিস এটা কোনো জাদুমন্ত্র?

তা হলে কী?

এখানে লেখা স্বরে অ—স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর ; উল্টো করে লিখেছি, তাই ধরতে পারিস নি।

আমি অবাক হয়ে আমার হাতের দিকে তাকালাম । সত্যিই তাই, একে উল্টো করে লিখেছে তার উপর মাত্রা দেয় নি, সে জন্যে ধরতে পারি নি। বোকার মতো আনিসের দিকে তাকলাম আমি।

আনিস বলল, মানুষের জোর নিজের ভিতরে। বিশ্বাসটা সেই জোরকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আমি ওটা লিখে দিয়েছিলাম যদি ওটাকে বিশ্বাস করে আরো খানিকটা জোর পাস সে জন্যে। আর কিছু না।

আমি মুখ হাঁ করে বসে রইলাম।

পায়রা নদীর ওপারে চলন্ত ভুতের খপ্পরে

রাবেয়া খাতুন

কলেজ ছুটি। কোথায যাবে, কোথায যাবে, কোথায় যাবে ভাবছে ওরা তিনজন। কাঞ্চন, বাউল, সুমন। তিন বন্ধু। লম্বা বন্ধ হলেই কোথাও যাবার জন্য মন কেমন কেমন করে। যায়ও। দেশ, বিদেশ, গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর। এবার কোথায় যাবে ভাবছে যখন, আচমকা ঘটল এক ঘটনা।

বাউলদের বাড়িতে দেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন সম্পর্কিত এক চাচা ।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ তোমরা?

চাচা খুব দুঃখি দুঃখি মুখে জবাব দিলেন, ভালো নয়।

কেন খরা গেল, বন্যা গেল এখন তো খারাপ থাকার কথা নয় |

তা নয়, তা নয় মিয়া বাই! দেশের অবস্থা জব্বর খারাপ।

মাথা ঝাকাতে বাকাতে চাচা বললেন, জল বন্যা কোম্ ছর। আমাদের পায়রা গ্রাম পড়েছে তার চেয়েও ভয়ংকর অবস্থার বিপাকে। রোজ রাতে অন্ধকার হলে ভূতেরা নেচে বেড়াচ্ছে পথেঘাটে !

সে কী? এ যুগে ভূত?

ভূতপ্রেত, জিন, দেও কিংবা আধুনিক সময়ের ভিন্ন গ্রহের প্রাণী যে নামেই ডাকুন তারা আমাদের গ্রামকে গরাদ বানিয়ে ছাড়ছে। আর শোনার দরকার হয়নি। খবরটা এখনে সংবাদপত্রে ওঠে নি। সুতরাং রহস্যের খোলস এখনো ভাঙে নি। কোনো সাংবাদিক পৌছে যাবার আগেই, তারা যাবে।

উদঘাদন করবে প্রকৃত বিষয়। বাউল খুব অল্পতেই উত্তেজিত হয়। ওটাই ওর স্বভাব। মোটামুটি কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, পায়রা নদীর পারে পায়রা গ্রাম। নামটাই যে টানছে।

চাচা চোখ বড় বড় করে বলল, ভুলেও যেন ও দিকটায় পা বাড়াতে যেওনা বাবারা। দারুণরাগী ভূত। বাইরে থেকে গিয়েছ শুনলে আগে তোমাদেরই ঘাড় মটকাবে।

বাউল জবাব দিল, কে কার ঘাড় মাটকায় দেখা যাবে চাচা।

চাচা অবাক চোখে দেখলেন। এ ব্যাপারে বাউলের পরিবার থেকে কোনো আপত্তিই উঠল না। ওরা ব্যাগ কাঁধে ফেলে দিব্যি তৈরি। জিনসের প্যান্ট, গেঞ্জি, কেডস, কোমরে বাম ব্যাগ। রোমাঞ্চকর উপন্যাসের জলজ্যান্ত নায়ক যেন। এসব ক্ষেত্রে নেতার ভূমিকা আপন থেকেই কাঞ্চনের ওপর এসে যায়। স্বভাবটা একটু রুখাশুখা। কিন্তু বুদ্ধিতে সবার চেয়ে ধারালো। জ্ঞানবিজ্ঞানে তুলনামূলকভাবে তুখোড়। কথাবার্তা কম বলে কিন্তু কাজে এগোয় নিঃশব্দে। যেমন পায়রা গ্রামটা কোথায়? তার ইতিহাস, ভূগোল, স্থানীয়জনদের শিক্ষাদীক্ষা, বিশ্বাস-মোটামুটি সব খবরই নেওয়া হয়ে গেছে এই একটি বেলায়। ঢাকা থেকে মাত্র বিশ মাইলের দূরত্ব। বাসরুট আছে। নদী পারাপার। গ্রামে বিদ্যুৎ যায় নি এখনো। ঝিলে-বিলে, ফল-ফুলের বাগানে, পাখপাখালির ডাকে একেবারে পাড়াগ্রাম পাড়াগ্রাম চেহারা। সুমন তো বলেই ফেলল, একেবারে ছবির মতো।

বাতাসে ম ম সুবাস। কোথায় কী যেন ফুটেছে। ঋতু অনুযায়ী ছাতিম,স্বর্ণচাঁপা, কদম, কেয়া,হাসনাহেনারও হতে পারে।

মাঠে কিশোররা খুশিতে কাছ মেরে হা-ডু-ডু খেলছে। একরকম ড্রেস তিনটি ফিটফাট তরুণকে দেখে এক পলক ওরা যেন দাঁড়িয়ে গেল। এরাও তেমনি। মল্লিক বাড়ির নাম বলতে একটি বালক তো নাচতে নাচতে পথ দেখিয়ে চলল।

এক ফাঁকে শুধাল, ও বাড়ির নানতাকে ভূতে ধরেছে। আপনার যাবেন ঐ ভূতের বাড়িতে।

বাউল যথেষ্ট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বলল, ওটা ভূতের নয় আমার দিলু চাচার বাড়ি। তো নোনতাটা কে?

জবাবে বালকটি জিভ কেটে বলল, ওর আসল নাম নোমান। খুব বদমেজাজী বলে আমরা ঐ নামে ডাকি। সে ঐ বাড়িরই ছেলে ।

সন্ধ্যা হয় হয়। আম জাম বাঁশ বনের ফাঁকে ফাঁকে কুপি আর হারিকেনের আলো। কিন্তু মল্লিক বাড়ির উঠানের জামরুল গাছে জ্বলছে হেজাক বাতি। বার বাড়ির সিঁড়িতে কারা অপেক্ষা করছিল। ওদের তিনজনকে দেখে খুবই হতাশ। তারা লৌহজঙের নন্দু ফকিরের আশায় আছে। তার ঝাড়ফুঁকে ভূত জিন কি ওদের বাপদাদারাও পালায়।

তবে ঢাকার মেহমান জেনে আদর-আপ্যায়নে ঘাটতি কিছু হলো না। ফকিরও এল যথাসময়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে টকটকে লাল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকা নোনতাকে ধমক দিয়ে প্রশ্ন করল, কী রে কী দেখছিস?

নোনতা প্রায় চেঁচিয়ে বলল, কী ভয়ংকর কী ভয়ংকর। হাতে টর্চ বুকে টর্চ। সেগুলো শুধু আমার দিকেই মারছে। বুঝেছি শয়তানের বাতি। গোরস্তানের ভূত। তুই ওখানে কী করতে গেছিলি ?

আমি...

নোনতা হেলাভোলা তাকিয়ে বলল, আমার মনে নেই।

না থাকলে হবে না। মনে কর। নইলে তোকে হলুদ পোড়া গন্ধে কষ্ট দেব। ঝাড়ুপেটা করব। গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখব।

ওরে দাদারে ওরে বাবারে তবে তো মরে যাব। ওঝা সাহেব মনে পড়েছে, আমি ইচ্ছে করে যাই নি। টর্চ হাতে ভূত আমায় ডাকছিল। যেতেই কবজ করে ফেলল। বাপরে আমি আর ছুটতে পারছি না।

বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল নোনতা। আবার আসব বলে ওঝা বিদায় হয়ে গেল তখনকার মতো।

একটু পর নোনতার জ্ঞান হলে কাঞ্চন ওর কাছে গিয়ে খুব নরম গলায় বলল, তুমি এখন কেমন আছ নোমান।

নোনতা বড় বড় চোখে তাকাল—আপনারা! সম্পর্কে তোমার ভাই হই। তোমায় দেখতে এসেছি। এখন বল তো যে ভূতটা তোমায় কবজ করেছে বলে ভাবছ সেটা দেখতে কেমন?

পুরোটা তো দেখি নি। ওর হাতে হাই পাওয়ারের টর্চ। তবে ওর একটা খেতাব আছে শুনেছি, বিজলি বাদশা।

নোনতা থামতে বাউলের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ভারি মজার নাম তো। এ যাবৎ মিসরের ফারাও,বাগদাদের খলিফা, পেরুর ইনকা, রাশিয়ার জার, জার্মানির কাইজার, আবিসিনিয়ার নেগাস,জাপানের মিকাড়ো,আফগানিস্তানের আমির,পারস্যের শাহ-এর খেতাব শুনেছি। কিন্তু বিজলি বাদশা--

ওকে প্রায় ধমক দিয়ে কাঞ্চন বলল, তুই থাম তো। হতেই পারে। এ পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি। হ্যা ভাই নোমান, বিজলি বাদশার টর্চ কি থেমে থেমে জ্বলে, না জ্বলতেই থাকে?

জ্বি না, থেমে থেমে জ্বলে। ওহ ওহ বড় ভয়ের। জ্বর জ্বর লাগছে।

নোমান চুপ করে যায়। রাত বাড়ছে। ওরা তিনজন চলে আসে নিজেদের ঘরে। সুমন সরাসরি বিছানায় উঠে পড়ে হাই তুলতে তুলতে বলে, আঃ জব্বর খাওয়া হয়ে গেছে! ভূতের বাড়ি হলে কী হবে? চাচিরা রাঁধেন উত্তম।

বাউল হারিকেন নিভাতে গেলে হা-হা করে উঠল আবার সুমন-এ্যাই করছিস কি? ভূতের বাড়িতে কি আলো নেভাতে আছে?

নেই। তবে বিজলি বাদশা তো অন্ধকারের ভূত নয়। তার নিজের হাতেই রয়েছে টর্চের আলো।

আসলে ভূত না কচু! ওটা দুষ্ট্র মানুষের করসাজি । হ্যালুসিনেশন নয় কে হলফ করে বলবে? মানে দৃষ্টিবিভ্রম যে কোনো মানুষের যে কোনো সময় হতে পারে।

এ্যাই তোরা একটু পণ্ডিতি কচকচি থামাবি?

আচমকা ঘরে যেন বোমরাস্ট হলো কাঞ্চন পায়চারি করছিল ঘর ভরে। একটু দাঁড়িয়ে চড়া গলায় কথাটা বলল। বাউলের আঁতে লাগল রীতিমতো। বলল, থামৰ ক্যান ঘরট কি তোর একলার?

না। তবে যা শুনলাম সেটা আমাদের সবার সমস্যা। এই বিশ শতকের শেষ সীমায় ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা যায় না। তবে এ ভূত সত্যিকারের ভূত। আমি সেই সম্পর্কেই ভাবছি। কিন্তু তোরা দুজন এলেবেলে কথা বলে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছিস ।

বাউল বিদ্রুপ করে বলল,ভণ্ডুল করে দিচ্ছি। উনি এলেন দস্যু মোহন, সিক্রেট এজেন্ট মাসুদ রানা, গোয়েন্দাপ্রবর কীরিটি রায় হয়ে। এখন ওনার কথা আমাদের টু শব্দটি না করে মানতে হবে।

মেনেই দেখি না কী হয়। হয়েছে তো আগে অনেক কিছু। সুমন সারেণ্ডারের ভঙ্গিতে দুহাত ওপরে তুলে পায়চারিরত কাঞ্চনের উদ্দেশে বলল, আমি ভাই ঘুমের রাজ্যে চললাম। তুমি যত পার ভাবনাচিন্তা কর।

বাউল একটু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, তবে আর কী। আমাকেও যেতে হয় ঘুমের দেশে ; কাঞ্চনটার সঙ্গে আমার আবার এক লহমা বনে না। কথাটা বলব কার সঙ্গে !

দুম করে হারিকেনের সলতে নিভিয়ে দিয়ে বাউল শুয়ে পড়ল। হারিকেনের আলো নিভতেই জানালা দিয়ে ভেতরে এসে পড়ল একচিলতে রুপালি চাঁদেরআলো। কাঞ্চনপায়চারি থামিয়ে খানিকক্ষণ নিবিড় চোখে দেখতে লাগল সেই জোছনার চমক। এক সময় লম্বা শ্বাস টেনে বিছানার দিকে এগুল ।

পরদিন সকালের রোদ ফুটতেই সে বেরিয়ে পড়ল। পায়রা নদীর পারে পায়রা গ্রামটি পায়রার মতোই ছোটখাটো। এই ভোরেও কেউ কেউ নদীতে নেমেছে গোসলের জন্য। গেরস্থ বৌ-রা মাটির কলসি কাঁখে যাচ্ছে পুকুরের দিকে। বালক-বালিকার ছিপারা-কোরান বুকে এগুচ্ছে মসজিদের দিকে। হাইস্কুলের দারোয়ান ডাস্টবিনে ময়লা ফেলতে ফেলতে এদিকেই তাকিয়ে আছে। কাছেই একটা চায়ের স্টল। শিউলি কদমের গন্ধ ছাপিয়ে হাওয়ায় ভাসছে ডালপুরী-আলুপুরীর ঘ্রাণ। একটু দূরে সদরে যাবার আধাপাকা রাস্তা। পোস্টাপিসের পিয়ন সাইকেল হাঁকিয়ে চলছে। তারপর খোলা কিছু পতিত জমি। তার ওপাশে কবরস্থানের অসমাপ্ত দেয়াল ।

বাউণ্ডারি ওয়াল। ভেতরে সারধরা ছোট-বড় কবর। কোনটায় বাঁশের বরফি কাটা বেড়ায় লতিয়ে আছে ঘন-নীল অপরাজিতা। কোনোটার মাথার দিকে বেলফুলের কুঞ্জ। কাছাকাছি বেশ বড় জলাভূমি। বৃষ্টির পানি জমে হয়েছে কিংবা আগাগোড়াই আমনি। সকালের সোনালি আলোয় ঝিকমিক করছে তরঙ্গহীন

পানির নহয় । দেখতে পেল পানির তলায় দুলছে একটি বড় গাছের ছায়া। খেয়াল করে নি..কাছেই রয়েছে এক বিশাল শিরীষ। কয়েকটি বালক ডালপালা ভাঙছে গুলতি তৈরির জন্য। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে পেছনে কিছু পড়ে যাবার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কাঞ্চন আশ্চর্য তার পিছু ধরে কখন ওরা দুজন এখানে এসে পৌছেছে টেরও পায় নি। একটা ইটের সঙ্গে হোচট খেয়ে বাউল পড়ে গিয়ে উঠতে চেষ্টা করে ফ্যাকাসে হাসি দিল। কাঞ্চন বলল, কী রে তোরা চোরের মতো– বাউল ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে রেগে গিয়ে বাধা দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, চোর আমরা না তুই ?

আমি?

চুপি চুপি যে ঘর থেকে বেরোয় সেই তো চোর। তুই যখন আমাদের জানান না দিয়ে পথে নামলি, তখনি বুঝেছি মতলব আছে।

মতলব ? সেটা আবার কী?

এই কিছু একটা আবিষ্কার করে একলা বাহাদুরি নেওয়া।

আবিষ্কার?

আমরা কি জানি না তুই বিজলি বাদশার রহস্য ভেদ করতে বেরিয়েছিস। তোরা সঙ্গে না থাকলে আবিষ্কারের তাবৎ বাহাদুরিটা তোর একার হয়ে যাবে না।

অ।

কাঞ্চনের মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। লাই পেয়ে সুমন বলল, তো আমাদেরও কিছু কাজটাজ দে। বিনা পরিশ্রমে আমরা কোনো খেতাব নিতে রাজি নই।

খাসা বলেছিস ।

বাউল ওর হাতে হাত মেলাল। কাঞ্চন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে পুরো এলাকাটুকু ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বলল, পেয়েছি। ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম বা অলীক নয়। পুরো বাস্তব।

ওর পেছন ঘুরতে ঘুরতে দুজন একই সঙ্গে প্রশ্ন করল, উমম... তার মানে কি বলতে চাস বিজলি বাদশার অস্তিত্ব বাতাসে নয়, এই মাটিতে।

ওদের বিস্ময় কৌতুহলের জবাব না দিয়ে কাঞ্চন তখন আপনমনে উচ্চারণ করছে,মিথেন,ফসফরাস,হাউড্রোজেন--- ওরা দুজন আবার গলামিলিয়ে বলল,মিথেন,ফসফরাস হাইড্রোজেন। তো তিনে মিলে হলো কী?

সে প্রশ্নে কান না দিয়ে কাঞ্চন বলল, ফেরা যাক খিদে পেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বড় গলায় সায় দিল সুমন—খিদে বলতে খিদে। আমার একবারে নাড়িভুঁড়ি চো চো করছে।

আমারও। শুধু কাঞ্চনের বদমেজাজের ভয়ে বলতে পারছিলাম না!

বাউল তাকিয়ে দেখল কাঞ্চনের প্রায় সব সময় গম্ভীর মুখ এখন হাসির আভায় বেশ পরিষ্কার।

বাড়ি ফিরে নাশতা সেরে বাউলরা এল নোনতার কাছে। সে তখনো ভয়ে কাতর। কাঞ্চন প্রশ্ন করল, আমরা একটা কথা জানতে এলাম। বিজলি বাদশার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কি গোরস্তানের ধারে?

কী করে জানলেন?

সে পরে হবে। আগে তোমার কথা বল।

জি ওখানেই। ঐ রেনট্রি গাছটার দিকে।

সন্ধেবেলা ঐ গাছতলায় তুমি গেছিলে কী করতে?

সন্ধে নয় গেছিলাম বিকেলে। ঐ গাছের ডালে চমৎকার গুলতি তৈরি হয়। ডাল ভাঙতে ভাঙতে মাগরেবের আজান পড়ে গেল ! তো ফাঁকা জায়গায় অন্ধকার

নামে দেরি করে। আমি ভয়টয় বড় একটা পাইও না। নিজের মনে কাজ করছি হঠাৎ দেখি জলার ধার থেকে টর্চ মারতে মারতে আমার দিকে এগুচ্ছে একটা কী?

কী মানে ? তার কি আকার আছে?

আছে না। তার আগেওর দেখা হয়েছে পূর্বপাড়ার মন্টির সঙ্গে। লিকলিকে শরীর। হাতে বেঢপ বিজলি বাতি। মিনমিনে নয় বেশ জোরদার আলো। জ্বলে আর নেভে। তালে তালে এগিয়ে আসে ভূতটা। ওকে দেখে মন্টি সেই যে জ্বরে পড়েছে, এখনো সারে নি। গ্রামের লোকেরা বলছে ও নাকি আর বাঁচবে না !

ভয়ে জ্বরের উত্তাপ বেড়ে যে কেউ মরতে পারে।

তার মানে বিজলি ভূত ওকে মারছে না।

নাঃ, ওর কী সাধ্য মানুষ মারে? ওর কি নিজের অস্তিত্ব বা শক্তি বলে কিছু আছে?

তাহলে কি বলতে চান আমি যা দেখেছি সবটাই মিথ্যে? উত্তেজনায় উঠে বসল নোনত। কাঞ্চন ওকে শুইয়ে দিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল, নানা মিছে হবে ক্যান? তুমি বা মন্টি যা দেখেছ ঠিকই দেখেছ। তবে যেরূপ দেখেছ সেটা তোমাদের কল্পিত চোখ এবং মনে দেখ রূপ। মানুষ ভয় পেয়ে অমন অনেক কিছু দেখে অনেক সময় !

নোনতা চি চি গলায় বলল, কিন্তু ঐ বাতিটা। ঝিলিক ঝিলিক টর্চের আলো।

প্রায় ঘর ভর্তি লোকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে কাঞ্চন শান্ত স্বরে বলল, তোমাকে কাল দেখে সকালে বেরিয়েছিলাম সরেজমিনে পুরো গ্রামটা দেখতে। এমন সুন্দর নামের গ্রাম তাতে কি মানায় এসব বিদঘুটে হাওয়া থেকে পাওয়া ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার?

একটু থেমে আবার মুখ খুলল কাঞ্চন। বলল, তো গোরস্তানের ভয়ের সব রহস্যের জট খুলে গেল। শুধু এই পায়রা গ্রাম নয়, পৃথিবীর মেলা উন্নত সভ্য দেশের কবরস্থানেও এই ভূতেরা নেচে বেড়ায়। আর ভয় দেখায় দুর্বলচিত্তের মানুষদের। ওটা আসলে আর কিছু নয় আলেয়ার আলো ।

নোনতা চোখ পিটপিট করে বলে, সত্যি বলছেন? আলোর খেলা ?

কাঞ্চন হেসে বলল, এক শ ভাগ। তিতাস গ্যাসের মূল অংশ হলো মিথেন। জৈব দেহাবশেষ থেকে প্রচুর মিথেন সৃষ্টি হয়। কিন্তু না জ্বলিলে তা জ্বলে না। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কোনো কবরস্থানে কাছের জলাভূমিতে মিথেন জ্বলে ওঠে ডাইফসফেন নামের ফসফরাস এবং হাইড্রোজেনের ক্রিয়ায়। পরে জানা গেল জৈব অবশেষ থেকে ফসফেট পাওয়া যায়, ডাইফসফেন পাওয়া যায় না। তাহলে আগুন জ্বলে কী করে?

গ্রামীণ লোকেরা একসঙ্গে প্রশ্ন করল, তা হয় কী করে?

জার্মানির দুই রসায়নবিদ এই ফাঁকটুকু পূরণ করেছেন কিছুদিন আগে। তারা খুঁজে পেয়েছেন সেই অণুজীব যা ফসফেট থেকে পরিণত করে ডাইফসফেনে, ওতে আলো জ্বলে। টর্চের মতো আলো। তা আবার চলাফেরা করে এখান থেকে ওখানে। মানুষ যা সাধারণত দেখে না তা নিয়েই যত ভয়, জল্পনা কল্পনায় ছড়ানো ।

নোনতা কথা শেষ হবার আগে উঠে বসেছে। গলা কাঁপছে তার উত্তেজনায়— তাহলে আমি যা দেখেছি তা আলেয়া, ভূতপ্রেত কিছু নয়।

একদম নয়। তুমি উঠে বসেছ। ঘোরাফেরা কর। জ্বরটর কিছু হয় নি।

কাঞ্চনের কথায় নোনতা বিছানা থেকে নেমে বলল,তাই তো। আমি সুস্থ। নোনতার কথা এবং স্বাভাবিক চলাফেরায় একঘর লোক যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ।

আতঙ্কের রাত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন সকাল থেকেই মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। পথঘাট জলে ডুবে গিয়েছিল একেবারে। যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অফিস কামাই করে ঘরে বসে ছিলাম! হঠাৎ সন্ধেবেলা অবনী এসে হাজির। ওর চুল উসকোখুসকো। চোখ দুটো লাল। কতদিন দাড়ি কামায়নি। বললাম, “কী ব্যাপার রে?”

অবনী একটি কথাও না বলে আমার ঘরে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে চুপচাপ বসে রইল। অবনী আমার বন্ধু ও একজন প্রেস ফোটোগ্রাফার। বিভিন্ন কাগজে ওর তোলা ফোটো ছাপা হয়। খুব স্মার্ট ও সুদর্শন যুবক। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে ওদের নিজেদের বাড়ি। সেখানেই থাকে এবং ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে।

অবনীর ওইরকম চেহারা দেখে বললাম, “তোর কী হয়েছে অবনী? এ কী চেহারা তোর!”

অবনী তার করুণ চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি বোধ হয় বেশিদিন বাঁচব না রে!”

“কেন, হঠাৎ এরকম মনে হওয়ার মানে ?"

অবনী বলল, “তুই ভূত বিশ্বাস করিস?”

“না। তবে ভূতের নামে ভয় পাই। কিন্তু চাক্ষুষ দেখিনি বলে বিশ্বাস করি না।”

“বাড়িতে আমি একদম টিকতে পারছি না। আজ কিছুদিন হল আমার ঘরে অদ্ভুত সব কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। আমার এত ভয় করছে যে, মনে হচ্ছে আমি আত্মহত্যা করি।”

ওর কথায় শিউরে উঠলাম আমি। বললাম, “ছিঃ অবনী, ও-কথা মুখেই আনতে নেই। কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করতে যাবি কেন?”

অবনী হঠাৎ বলল, “আচ্ছা, আমি পাগল হয়ে যাইনি তো?”

আমি বললাম, “মনে হচ্ছে তাই হয়েছিস। যাক তোর ভাই কী করছে?”

“সে মাস দুই হল দুর্গাপুরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে।”

“তুই তা হলে বাড়িতে একা?”

“হ্যাঁ। কিন্তু বিশ্বাস কর, আজ কিছুদিন হল ও বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। আমার বড় ভয় করছে। ওখানে আমি প্রতি রাতে আর একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছি।”

“কে সে!”

“তা জানি না। তবে সে যে অশরীরী তা আমি বুঝতে পারি।”

আমি নিজেই তখন স্টোভে জল গরম করে চা বসালাম। তারপর দুবন্ধুতে চা খেয়ে একটু আয়েস করে গুছিয়ে বসলাম।

অবনী বলল, “আমি ভাবছি কিছুদিন তোর এখানে থাকব। তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো?”

“না না, অসুবিধে হবে কেন? তবে আমার মনে হয় তোর আমার কাছে থাকার চেয়ে আমারই বরং তোর ওখানে থাকা ভাল।”

“খবরদার। ওখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না। তুইও পারবি না। আমার মতো তুইও তা হলে পাগল হয়ে যাবি। আমি ভাবছি ও বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যাব।”

“তোর ভাই আপত্তি করবে না?”

"বোধ হয় না। ওকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। সামনের মাসে ও সোজা তোর এখানে চলে আসবে। তারপর এইখানে বসে আলোচনার পর যা হয় একটা কিছু ঠিক করে নেব।"

"ও বাড়িতে তোরা কতদিন আছিস ?"

"ওটা তো আমাদের পৈতৃক বাড়ি। আমার বা আমার ভাইয়ের জন্মই ও বাড়িতে।"

"এর আগে আর কখনও ওরকম অস্তিত্ব অনুভব করেছিস ?"

"না, কখনও না। এমনকী দিন পনেরো আগেও না।"

আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর বললাম, "ঠিক কী কী হয় বল তো?"

অবনী একবার হাতের ঘড়িটা দেখল। তারপর বলল, "তুই যখন নিজেই যেতে চাইছিস তখন আমার মনে হয় আমার কথা না শুনে সবকিছু তোর নিজের চোখেই দেখা বা অনুভব করা ভাল। কেননা আমার সব কথা তুই বিশ্বাস করবি কিনা তা তো জানি না। তবে তুই গেলে আমি খুব খুশি হব। কেননা আমিও দেখতে চাই আমার ঘরে আর একজনের উপস্থিতি সত্ত্বেও ওইসব ঘটে কিনা। যদি যাস তো এখুনি চল। লাস্ট ট্রেনটা পেয়ে যাব তা হলে।"

আমি বললাম, "না। আজ এই দুর্যোগের রাতে নয়। কাল সকালে বরং যাব। তারপর দু-একদিন থেকে আবার তোকে সঙ্গে নিয়েই ফিরে আসব। যতদিন তোর ভাই না আসে ততদিন তুই আমার কাছেই থাকবি। এ অবস্থায় তোকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

অবনী বলল, "তা হলে খুব ভাল হয় রে! আমার এখন মাথার ঠিক নেই। আমার ভাল-মন্দর ভার এখন তোর হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে এও জেনে

রাখিস, আমি আর কোনওদিনই একা থাকতে পারব না। সবসময়ের জন্য আমার একজন সঙ্গী অবশ্যই চাই।”

এরপর আমরা দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে কাটালাম। আলুভাজা আর গরম লুচি খেয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম দু’জনে। শোওয়ার পরেই ঘুম ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠে অবনী বলল, “ওঃ, কতদিন যে এমন আরামে ঘুমোইনি। আমার তো একদম ইচ্ছে করছে না ওই অভিশপ্ত বাড়িতে ফিরে যেতে।"

আমি বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বললাম, “তোর ওখানে যাওয়ার গাড়ি কখন?”

“সেই বেলা একটায়।”

“সে কী। সারাদিনে আর গাড়ি নেই?”

“না। একটা ছিল সকালে, সেটা এতক্ষণে ছেড়ে গেছে।”

তা যাক। বেলা একটার গাড়িই সই। দুপুরে খেয়েদেয়ে দু'জনে হাওড়া স্টেশনে এলাম। তারপর বারহারোয়া প্যাসেঞ্জারে তিনটের মধ্যেই ত্রিবেণী। সেখান থেকে রিকশায় চেপে গঙ্গার ধারে ওদের বাড়িতে। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। অবনীর সঙ্গে আমাকে আসতে দেখে আশপাশের লোকেরা এবং দোকানদাররা চাপা গলায় ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে লাগল। আমি তখনকার মতো আড়চোখে সবকিছু দেখে নিলাম। তারপর অবনীদের বাড়িতে গিয়ে দোতলায় ওর শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। ওর ল্যাবরেটরি নীচে। একপাশে খোলা ছাদ। ওর ঘরের ভেতর থেকে গঙ্গা দেখা যায়। ছাদ থেকে শ্মশান।

অবনীর বাড়িতে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে চা-পর্ব শেষ করলাম। তারপর বললাম, "অবনী, আমি একবার আধঘণ্টার জন্য বাইরে যাচ্ছি। তুই একা থাকতে পারবি তো?"

অবনী বলল, "তা পারব। এখন দিনের বেলায় তো কোনও ভয় নেই। যা কিছু উপদ্রব রাত্রে। তুই কিন্তু বেশি দেরি করিস না।"

"না রে বাবা, না। তোকে একা রেখে আমি কখনও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারি?"

আমি অবনীদের বাড়ি থেকে বেরোতেই পাশের বাড়ির একজন বয়স্কা মহিলা আমাকে ডাকলেন, "বাবা শোনো।" আমি কাছে গেলে বললেন, "তুমি অবনীর কে হও?"

"আমি ওর বন্ধু হই। কেন বলুন তো?"

"তুমি এসেছ খুব ভালই হয়েছে। হঠাৎ কী যে হল ছেলেটার। মাঝরাত্তির হলেই চিৎকার করবে আর ঘরময় ছুটোছুটি করবে। আমার মনে হচ্ছে কেউ কিছু খাইয়ে দিয়ে মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে ওর। তুমি বাবা ওর ভাইকে একটা খবর দাও। আর পারো তো কোনও মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাও।"

"আমি সেইজন্যই এসেছি মা।"

"বেশ করেছ বাবা। বেশ করেছ।"

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সেই দোকানগুলোর কাছে এলাম, যেখানে একটু আগেই ওকে দেখে সকলে ফিসফিস করে কীসব বলাবলি করছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, "আচ্ছা আপনারা তো অবনীকে চেনেন, আমার বন্ধু হয়। একটু আগে আপনারা ওকে দেখে কীসব যেন ফিসফিস করে বলছিলেন। সেইজন্যই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। কী ব্যাপার বলুন

তো? আপনারা কি ওর মধ্যে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করেছেন? আমি কিন্তু ওকে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ মনে করছি।”

দোকানের লোকেরা বলল, “হ্যাঁ। আমরাও ওকে হঠাৎ এইরকম হয়ে যেতে দেখছি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন? ও প্রায় রাতেই চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়।”

এমন সময় ওদের ভেতর থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে বলল, “দাদা, আমি এক রাতের একটা ঘটনার কথা বলব? শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভাববেন মিথ্যে কথা বলছি। আমার কথা এরা কেউ বিশ্বাস করে না। হাসে। ,মনে করে আমি বোধ হয় বানিয়ে বলছি।”

“বেশ তো, শুনিই না কী ব্যাপার?”

“শুনন তবে সেদিন রাতে অবনীদা যখন চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় তখন আমি আর ওর পাশের বাড়ির বিষ্টুদা ছুটে যাই। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।”

“কীরকম!”

অবনীদা নীচের দরজায় খিল দিয়ে ওপরের ঘরের দরজাও বন্ধ করে শোয়। সেদিন অবনীদার চিৎকার শুনে আমি আর বিষ্টুদা ছুটে গিয়ে নীচের দরজায় ধাক্কাধাব্ধি করতে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর দেখলাম দরজার খিলটা কে যেন খুলে দিল। আমরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ওপরের দরজায় ধাক্কা দিলাম। অবনীদার সাড়া নেই। তারপর হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রবলে ওপরের ঘরের দরজাটাও খুলে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকে দেখলাম অবনীদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, যে বাড়িতে অবনীদা একা থাকে সে বাড়ির বন্ধ খিল আমাদের ধাক্কাধাক্কির পর খুলে দিল কে?”

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ষ্ট্রেঞ্জ!"

যুবকটি বলল, "অথচ আমার বা বিষ্টুদার এই কথা এখানকার কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না।"

আমি বললাম, "দেখুন, আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, আমি করছি। তাই বলছি, আজ রাত্রে আপনাদের ভেতর থেকে একজনও যদি কেউ আমাদের কাছে থাকেন তা হলে খুব ভাল হয়। আজ রাত্রে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই এখানে কী হয় না হয়।"

কিন্তু না। আমার কথায় রাজি হল না কেউ। সবাই বলল, "না দাদা। ও বাড়িতে রাত্রিবাস কিছুতেই করছি না। বলা যায় না যদি সত্যিই ভৌতিক ব্যাপার কিছু হয়, তা হলে কার কোপ কার ঘাড়ে চাপে। তবে হ্যাঁ, যদি সেরকম ভয়াবহ কিছু দেখেন তা হলে চেঁচিয়ে ডাকবেন আমাদের। আমরা একজন নয়, সবাই ছুটে যাব। আর পারেন তো দরজার খিলটা খুলে রাখবেন।"

আমি আচ্ছা' বলে চলে এলাম।

আমি যখন ফিরে এলাম তখন দেখি অবনী ছাদের আলসের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসে বললাম, "কী রে, একা থাকতে ভয় করেনি তো?"

অবনী ঘাড় নেড়ে বলল, "না। তবে মনে খুব একটা সাহসও পাচ্ছিলাম না। তাই বদ্ধ ঘরে না থেকে খোলা ছাদে এসে বসে আছি।"

"বেশ করেছিস। এখন চল দেখি গঙ্গার ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কোথাও নয়। ওই দেখ, আকাশের অবস্থা। এই নামল বলে!"

"তা হলে চল ঘরে বসে রাতের খাওয়াটা তৈরি করা যাক।"

"কী খাবি বল?"

"স্রেফ ডিমের ঝোল আর গরম ভাত।"

আমরা দুজনে ঘরে ঢুকে স্টোভ ধরিয়ে ভাত বসালাম। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হল। ভাত হয়ে গেলে ডিমসেদ্ধ বসাচ্ছি তেমন সময় শুরু হল প্রবল বর্ষণ। সে কী প্রচণ্ড বৃষ্টি। গতকালের রেকর্ড বৃষ্টিকেও যেন হার মানায়।

এরই মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "অন্যদিন কি এমন সময় উৎপাত আরম্ভ হয়?"

"কোনও ঠিক নেই। কখনও সন্ধের পর থেকেই হয়, কখনও মাঝরাতে। অবশ্য তুই থাকার জন্য যদি না হয় তা হলে আলাদা কথা।"

আমি নিজের মনেই নানারকম কল্পনা করতে লাগলাম, এখানে কী ঘটে না ঘটে তাই নিয়ে। অবনী এখনও পর্যন্ত আমাকে কিছুই বলেনি।

রাত তখন দশটা। এ পর্যন্ত সময়টা বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল। আমি আর অবনী একই তক্তাপোশে একই বিছানায় দুজনে পাশাপাশি শুলাম। শুয়ে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অবনী আমার কাছ ঘেঁষে সরে এসে বলল, "এইবার, এইবার সে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।"

"কে? কে আসবে?"

অবনী চিৎকার করে উঠল, "ওই। ওই তো সে। ওই দ্যাখ।"

আমি শুয়ে-শুয়েই জানলার দিকে তাকালাম। দেখলাম জানলার ঘষা কাঁচে ফ্রক পরা চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে এলোচুলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কঠিন গলায় বললাম, "কে তুমি!"

মেয়েটি নিরুত্তর।

এমন সময় ফুস করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হল। তারপরই দেখা গেল টেবিলের বাতিটা জ্বলছে। এ ঘরে আমি আর অবনী ছাড়া আর কেউ তো নেই। তা হলে কে জ্বালল এই বাতি?

কে? কে সেই অশরীরী ?

ততক্ষণে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেছে।

আমরা দুজনেই ভয়ে কাঠ।

চারদিক নিস্তব্ধ। নিঝুম। অবনী যেন নীল হয়ে গেছে।

আমার সারা শরীর ঘেমে উঠল।

এমন সময় দেখতে পেলাম একটা হাত সেই বাতিটা তুলে নিল। নিয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল। তারপর কোমল গলার একটি ডাক শোনা গেল, “এসো।”

আমি অবনীকে বললাম, “আয় তো, কোথায় নিয়ে যায় ও দেখি।”

অবনী বলল, “না না। খেপেছিস? ও আমায় রোজ ওইভাবে ডাকে। আমি যাই না।”

“আয়। আয় বলছি।”

“আমার বড় ভয় করছে।”

“ভয় কী? আজ তুই একা নয়। আমি তো আছি সঙ্গে। আয়।”

আমি প্রায় জোর করেই ওর হাত ধরে টেনে তুললাম। তারপর টর্চটা নিয়ে দরজার দিকে এগোলাম। দরজার খিল আপনা থেকেই খুলে দরজাটা দুহাট হয়ে গেল।

আলো আমাদের পথ দেখিয়ে চলল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল আলোটা। তারপর নীচের ঘরের দরজার কাছে গেল। যে ঘরে অবনীর ল্যাবরেটরি সেই ঘরের কাছে থামল আলোটা।

ঘরে তালা দেওয়া ছিল। তালাটা আপনিই খুলে গেল।

আমরা দুজনেই ঘরে ঢুকলাম।

বাতিটা টেবিলের ওপর রেখে হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কারও অস্তিত্বও রইল না সেখানে।

আমি বললাম, "কী হল? কথা কও। কথা কইছ না কেন? বলো তুমি কে?"

অবনী যেন পাথর।

আমারও হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

এমন সময় শুনতে পেলাম সেই কিশোরীর কণ্ঠস্বর, "আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছ? আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে বন্দি করে রেখো না। তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি।"

আমি ভয়ে-ভয়েই বললাম, "কে তুমি!"

"আমি শ্যামা।"

"তুমি কোথায়? কে তোমাকে বন্দি করে রেখেছে?"

"আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? এই তো আমি। আমি এখানে।"

কণ্ঠস্বর শুনে ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই কিশোরীর জোৎস্নার মতো হালকা শরীর অন্ধকারে ফুটে উঠল। কী করুণ তার মুখ। সে একটু একটু করে তার ছায়া শরীর নিয়ে অবনীর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ড্রয়ার টেনে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর রাখল। রেখেই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে খামটা খুলতেই তার ভেতরে এই কিশোরীর একটি ফুল সাইজের ফোটো দেখতে পেলাম। ফোটোর দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখলাম ফোটোর ছবির মুখটা কীরকম যেন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

উঃ, কী বীভৎস দৃশ্য! আরও দেখলাম ছবির গলার ওপর একটা মোটা শক্ত দড়ির দাগ ফুটে উঠছে ক্রমশ। এক সময় ফোটোর ভেতর থেকে মেয়েটি চিৎকার

করে বলে উঠল, "এখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? আমার কষ্ট হচ্ছে না বুঝি? আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা এখুনি এটাকে নষ্ট করে দাও। ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে আগুনে পুড়িয়ে দাও।"

আমি বললাম, "তা হলেই কি তোমার মুক্তি হবে ?"

"হ্যাঁ। চিরতরে মুক্তি পাব আমি। আমি যে আমার অস্তিত্ব পৃথিবীতে কোথাও এতটুকুও রেখে যেতে চাই না।"

"কিন্তু কেন চাও না ?"

"সে তোমাদের জানবার দরকার নেই। শুধু জেনে রেখো, যাদের ওপর অভিমান করে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছি, তাদেরই দেওয়ালে ছবি হয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ছবিটি ছিড়ে দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে ফেললাম।

অবনীকে বললাম, "এই ফোটো তোর তোলা?"

"হ্যাঁ। বছর দুয়েক আগে তোলা। চুঁচুড়ার হরিবাবুর মেয়ের ছবি ওটা। ওর জন্মদিনে তুলেছিলাম। কিছুদিন আগে হরিবাবু কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার হাত দুটি ধরে মেয়ের ছবিটি চাইলেন। জানালেন, গত মাসে সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে মেয়েটিকে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খুব বকবকি করেন। তারপরেই বিপর্যয়। মেয়েটি হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।"

"কিন্তু বছর দুই আগে যে ছবি তোলা হয়েছিল সে ছবি হরিবাবু এতদিন বাদে নিতে এলেন কেন?"

"বছর দুই আগে ছবিটা আমি তুলেছিলাম ঠিকই, তবে ছবি তোলার পর থেকে হরিবাবু টাকা দেওয়ার ভয়ে আমার সঙ্গে আর দেখা করেননি। আমিও ফোটোর নেগেটিভ ওয়াশ করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন মেয়ের স্মৃতিরক্ষা করবার জন্য হরিবাবু ডবল চার্জ দিয়ে ছবি নিতে এসেছেন। সম্পূর্ণ টাকা দিয়েও

গেছেন। কিন্তু মুশকিল হল হরিবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেগেটিভটা কোথাও আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নেগেটিভ পেলাম। কিন্তু নেগেটিভ থেকে এই ফোটো তৈরি করতে গিয়েই যত বিপত্তি। বারবার নেগেটিভের ভেতর থেকে, ফোটোর ভেতর থেকে মেয়েটি আমায় শাসাতে থাকে। ভয় দেখায়। সেজন্য নীচের ঘরে ঢোকাই আজকাল আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

"সেই নেগেটিভটা আছে?"

"আছে।"

"দেখি।"

অবনী নেগেটিভটা আমার হাতে দিতেই আমি সেটাকেও অগ্নিদগ্ধ করলাম। তারপর ধীরে ধীরে টর্চের আলোয় পথ দেখে দরজা বন্ধ করে ওপরে এলাম।

সারারাত ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করলাম দু'জনে। বৃষ্টির বেগও কমল। ভোরবেলা চা করে খেলাম। ভোরের আগে কারেন্টও এসে গেল।

অবনীকে বললাম, "আজ একবার সময়মতো হরিবাবুকে টাকাটা তুই ফেরত দিয়ে আসবি। কেমন? বলবি, নেগেটিভটা হারিয়ে গেছে।"

অবনী বলল, "নিশ্চয়ই।"

এর পরও অবনীর বাড়িতে আমি দিনদশেক ছিলাম। কিন্তু না। সে রাতের পর থেকে আর কোনও উপদ্রবই ও বাড়িতে হয়নি। এখনও না।

পীরবাবার রাত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল রেলের চাকরি দিয়ে। বি. আর. আই. কে. জি. পির (ব্রিজ ইনস্পেক্টর, খড়্গপুর) আন্ডারে একটি ছোট পোস্টে চাকরি পেয়েছিলাম। আমাদের কর্মস্থল ছিল শালিমার। তবে মাঝেমধ্যে খড়্গপুর টাটানগর সিনি গিধনি ভদ্রকেও কাজকর্ম নিয়ে যেতে হত। কিন্তু সে যাওয়া নাম কা ওয়াস্তে। গেলুম, প্রচণ্ড গতিতে কাজ করলুম এবং ফিরে এলুম। ঘোরা, বেড়ানো কিছুই হত না। তাই একবার আমরা বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম কিছু না হোক এক রাত খড়্গপুরে সোমসাহেবের বাংলোয় গিয়ে কাটিয়ে আসব।

সাহেব প্রতি শনি-রবিবার কলকাতার বাড়িতে চলে আসতেন। আমরা সাহেবের অনুমতি নিয়ে এক রাত তাঁরই বাংলোতে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গী ছিলাম চারজন। হিরু, আমি, রবি এবং মুন্না। তখন পৌষ মাস। কনকন করছে ঠাণ্ডা। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ ট্রেনে চেপে খড়্গপুরের দিকে রওনা হলাম।

সন্ধের আগেই খড়্গপুরে পৌঁছলাম আমরা।

স্টেশন থেকে নেমে হাঁটাপথে আমরা যখন সোমসাহেবের বাংলোর দিকে যাচ্ছি তখন হঠাৎ বিনোদের সঙ্গে দেখা। বিনোদ আর আপ্পারাও ছিল সোমসাহেবের ট্রলিম্যান। এরা দুজনেই আমাদের পূর্ব পরিচিত।

আমাদের দেখেই বিনোদ বলল, “আরে, কী ব্যাপার! আপনারা ?”

আমরা ভেবেছিলাম বিনোদ বোধ হয় আমাদের খাতির করে নিয়ে যাবে বলে আসছে। তার জায়গায় এইরকম প্রশ্নে চমকে উঠলাম। বললাম, “কেন, তুমি জানো না? আমরা তো আজ রাত্রে সাহেবের বাংলোয় থাকব।”

“সাহেবের বাংলোয়? মাথাখারাপ নাকি? সাহেব আজ পর্যন্ত নিজের ছেলেকেই এখানে আসতে দেননি।”

“কিন্তু সাহেবের সঙ্গে তো কথা হয়ে গেছে। উনি অনুমতি দিয়েছেন।”

“ও। তা কই সেরকম কিছু তো উনি বলেননি আমাদের।”

“হয়তো বলতে ভুলে গেছেন।”

বিনোদ একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল, “তা হলে তো মুশকিল হল।”

“মুশকিল কীসের? সাহেব চাবি দিয়ে যাননি?”

“নানা, তা নয়। ডুপ্লিকেট চাবি তো আমার কাছে থাকে। কিন্তু আপনাদের অসুবিধে হয়ে যাবে খুব। ওখানে কি আপনারা থাকতে পারবেন?”

হিরু বলল, “কেন, কী ব্যাপার! থাকতে পারব না কেন?”

“সাহেব আজ ছুটির পর বাড়ি যাবেন বলে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু একটু আগেই স্টেশন থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। সিনিতে ব্লক। জি. এম. আসবেন। তাই ভাবছি সাহেবের সঙ্গে ওই বাংলোয় আপনারা কী করে থাকবেন?”

আমরা চারজনেই লাফিয়ে উঠলাম শুনে, “অসম্ভব।” কেননা সোমসাহেব অত্যন্ত ভারিক্কি এবং বদমেজাজি লোক। ওঁর স্ত্রী পুত্র পরিজনরাও বাঘের মতো ভয় করে সোমসাহেবকে। আর আমরা, যারা তাঁর অধীনে অনেক ধাপ নিচুতে কাজ করি আমাদের কাছে তো তিনি এক মূর্তিমান বিভীষিকা। বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে সাহেবের ফেস টু ফেস কথাও হয়নি। আমাদের সুপারভাইজার বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলেন সাহেবকে। এখন কোন সাহসে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব?

এবং গেলেও লাভ কি হবে? আশ্রয় তো পাবই না। উলটে হাজার রকম কাজের ফিরিস্তি চেয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

আমি বললাম, "না। যে লোকের চোখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, তার সঙ্গে একত্রে এক রাত এক আশ্রয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমরা অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি। এক রাত একটু আনন্দ করে কাটাতে। কোথায় একটু হইহল্লা করব, এ ওর পেছনে লাগব, গলা ছেড়ে গান গাইব, কিন্তু এখানে আশ্রয় পেলেও সেসব তো হবেই না, উলটে চোরের মতো মুখ বুজে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

বিনোদ বলল, "আমিও তাই বলি, আপনারা বরং অন্য কোথাও চলে যান।"

মুন্না বলল, "অন্য কোথায় যাব বলুন?"

"হয় হোটেলে উঠুন, নয়তো এখুনি বম্বে এক্সপ্রেস আসবার সময় হয়ে গেছে, ওই গাড়িতে চেপে আপনারা সোজা ঝাড়গ্রামে চলে যান। ঝাড়গ্রাম এর চেয়ে অনেক ভাল জায়গা। খুব ভাল লাগবে আপনাদের। ঘুরে বেড়িয়ে শান্তি পাবেন।"

বিনোদের কথায় আমাদের মন কিন্তু সায় দিল না। আমরা যখন কী করব, কী না করব ভাবছি তেমন সময় সাহেবের আর এক ট্রলিম্যান আপ্পারাও এসে হাজির, "এই যে! আপনারা সব এসে গেছেন দেখছি। কতক্ষণ এসেছেন?" "সবে আসছি। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমাদের আসবার কথা?"

"সাহেবের মুখে এখনই শুনলাম। সাহেব বললেন, আমি সকালে বলতে ভুলে গেছি। ছোঁড়াগুলো এখুনি হয়তো হাজির হবে। ওদের আজ এখানে আসবার কথা। তা আমি যখন এখানে ফিরে এসেছি তখন ও চারটেতে তো এখানে থাকতে পারবে না। তার চেয়ে ওদের ইঁদায় ছেড়ে দিয়ে আয়।"

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। ইঁদায় ছেড়ে দিয়ে আয় কী রে বাবা!

আপ্পারাও বলল, “চলুন আপনাদের ইঁদায় ছেড়ে দিয়ে আসি। ওখানে সাহেবের বোনের বাড়িতে আপনাদের নেমতন্ন। সাহেব ফোনে বলে দিয়েছেন ওঁদের।”

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে ঠেকল আমাদের কাছে। সাহেবের বোনের বাড়িতে নেমন্তন্ন? যাদের কখনও চোখেই দেখিনি তাদের বাড়িতে কোন সুবাদে নেমন্তম খেতে যাব?

বিনোদ বলল, “না না লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। সাহেব এমনিতে বদমেজাজি লোক হলেও সাহেবের মন কিন্তু ভাল। এখানে যখন থাকা হবে না, তখন ইঁদায় আপনাদের যেতেই হবে। কিন্তু ওখানে থাকতে পেলেও খাবেনটা কী? কোনও হোটেল তো নেই। সেইজন্যই ওই ব্যবস্থা। তবে ইঁদায় কি আপনারা থাকতে পারবেন?”

আমি এবার অধৈর্য হয়ে বললা,‘আচ্ছা সেই থেকে যে তোমরা ইঁদা ইঁদা করছ, ইঁদাটা কী?’

“ওমা! সে কী! ইঁদা জানেন না ?”

“না। জানলে জিজ্ঞেস করি ?”

হিরু বলল,‘কোন বাংলো জাতীয় কিছু নিশ্চয়?’

“উহু। বাংলো হতে যাবে কেন? ইঁদা হচ্ছে এখানকার একটা জায়গার নাম। ভাল নাম ইন্দা। এর কাছেই পীরবাবা।’

“তা হলে তাই যাওয়া যাক।”

বিনোদ বলল, “তা তো যাবেন, কিন্তু—” বলেই বলল, “আচ্ছা আসুন তো আগে। তারপর দেখা যাবে। এখন চলুন ওই দোকানটায় বসে একটু চা খাওয়া যাক।”

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম সেখানে একটি চায়ের দোকান ছিল। বিনোদ আর আপ্পারাও আমাদের সেই দোকানে বসিয়ে চা-বিস্কুটের অর্ডার দিল।

বিনোদ বলল, “আসলে ইঁদায় যেখানে সাহেব আপনাদের পাঠাচ্ছেন সেখানে রাত্রিবাস করবার কথা আমি অন্তত আপনাদের বলতে পারব না।”

“সে কী! কেন ?”

আপ্পারাও বিনোদকে বলল, “ওই বাড়িতেই যে সাহেব ওদের পাঠাচ্ছেন তার কি মানে? আগে বাড়িটা দেখা হোক। সাহেবের বোনের বাড়িতেও তো থাকতে দিতে পারেন।”

বিনোদ বলল, “না না। অত সস্তা নয়। ওরা সেই লোক নাকি? ওদেরই বলে থাকতে জায়গা কুলোয় না, আবার অন্য লোককে থাকতে দেবে। আর নেমতন্নর কথা বলছ? সে তো সাহেবের অনুরোধে। সাহেব নিশ্চয়ই ফোনে বলে দিয়েছেন যা খরচা হয় দিয়ে দেবেন।”

আমরা সব শুনে চা খেতে খেতে বললাম, “আপ্পাদা, আমাদের আর খড়গপুর বেড়িয়ে কাজ নেই। আমরা পরের ট্রেনেই কাটছি। তুমি গিয়ে বরং সাহেবকে বোলো যে, আমরা আসিনি।”

বিনোদ বলল, “না না। সেটা ঠিক হবে না। অনেকক্ষণ ধরে আমরা এখানে বসে কথাবার্তা বলছি। যদি কেউ দেখে থাকে বা সাহেবের কানে ওঠে, তা হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। মিথ্যে কথা বলার জন্য আমাদের বকবিকি করবেন সাহেব। তা ছাড়া ওখানে আপনাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ওসব যদি

নষ্ট হয় তা হলে না এসে কথার খেলাপ করার জন্য আপনারাও কি রেহাই পাবেন?”

সত্যি বলতে কি আমাদের সব আনন্দই তখন মরে গেছে। চা খেয়ে আমরা বিনোদ আর আপ্পারাওকে অনুসরণ করলাম। রাতের অন্ধকারে আমরা লাইন পেরিয়ে গোলবাজার হয়ে পীরবাবা ঘুরে ইঁদায় পৌঁছলাম।

ইঁদায় সাহেবের বোনের বাড়িতে আমাদের পৌছে দিয়ে বিনোদ, আপ্পারাও দু'জনেই বিদায় নিল।

সাহেবের বোন, ভগ্নিপতি দুজনেই যথেষ্ট সমাদর করে বাড়ির বৈঠকখানায় বসালেন আমাদের। তারপর এ-কথা সে-কথার পর বললেন, “দেখো বাবারা, সাহেব তোমাদের এখানে তো পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের তো ভাড়াবাড়ি। নিজেদের থাকতে কুলোয় না। তোমরাও আবার একজন-দুজন নও, চার-চারজন। কী করে থাকতে দিই বলো তো? তবে মাস ছয়েক হল কাছাকাছি আমরা একটা বাড়ি তৈরি করেছি। কিন্তু বাবা, ওই বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করে এক রাতও থাকতে পারিনি আমরা। সে এমনই উপদ্রবের বাড়ি যে, সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে পথ পাইনি। তোমাদের থাকার জন্য সেই বাড়িটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু বাবা, তোমরা কি থাকতে পারবে সেখানে?”

আমি বললাম, “সাহেব জানেন, ওটা ভূতের বাড়ি ?”

“তা আর জানে না? সবই জানে।”

“তা হলে উনি জেনেশুনে ওই বাড়িতে আমাদের থাকতে পাঠাচ্ছেন কেন?”

“সে-কথা তোমাদের সাহেবকেই জিজ্ঞেস কোরো। তবে বাবা, সাহেবকে তোমরা তো ভাল করেই চেনো? ও আবার ওসব ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। আমরা যেই না বলেছি ওই ভূতের বাড়িতে ছেলেগুলো থাকবে কী করে, অমনই

আমাদের একটা তেড়ে ধমক বলল, ভূতের নিকুচি করেছে। আসলে তোমরা নিজেরাই ভূত। তাই নিজের বাড়ি ফেলে রেখে ভাড়াবাড়িতে বাস করছ।”

রবি বলল, “তা হলে ও বাড়িটা আপনারা বিক্রি করে দেননি কেন?”

“কে কিনবে ? সবাই তো জেনে গেছে ও বাড়ির ব্যাপার।"

আমি বললাম, “আমরা চারজন আছি। পারব না একটা রাত ওখানে কাটাতে? কাল সকালেই আমরা ঘর ছেড়ে দেব। তারপর সারাদিন ধরে খড়গপুরটা ঘুরে দেখে বিকেলের গাড়িতে চলে যাব কলকাতায়।”

“থাকতে পারলে তো ভালই। তবে কিনা যদি ভয় পাও তাই আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। পরে যেন বোলো না বাবা, আমরা তোমাদের বিপদে ফেলব বলে ওই ঘরে পাঠিয়েছি।”

আমরা তখন সবাই একমত হয়ে বললাম, “ঠিক আছে। একটা রাত বই তো নয়, আর চারজন যখন আছি তখন থেকেই দেখি না এক রাত। হয়তো একটু ভয়ডর পাব। তাই বলে সত্যি-সত্যিই ভূত এসে তো গলা টিপে মেরে ফেলবে না আমাদের!”

“দেখো বাবা। কী কুক্ষণেই যে জমিটা কিনেছিলুম, কত শান্তি স্বস্ত্যয়ন করালাম। কত কী করলাম, কিছুতেই কিছু হল না।”

“তা না হয় হল। বাড়ির ভেতরে হয়টা কী ?”

“সে-কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না বাবা। যদি থাকো এক রাত তো বুঝবে।”

হিরু আর মুন্না এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সব শুনে বলল, “হল ভাল। কোথায় এলাম একটু আনন্দ করতে, তার জায়গায় ভূতের বাড়িতে থেকে প্রেতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? কী ঝকমারি করেই ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম আজ।”

“সবই কপাল।”

যাই হোক! আমরা সে রাতে সাহেবের বোনের বাড়িতে ভাজাভুজি ফুলকপির তরকারি লুচি আর ডিমের ডালনা খেয়ে নতুন বাড়িতে শুতে গেলাম। বাড়িটা ঠিক ইঁদায় নয়। পীরবাবায়।

সাহেবের ভগ্নিপতি নিজে গিয়ে আমাদের ঘরের চাবি খুলে ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন। চমৎকার বাড়ি। নতুন। একতলা। ঘরে খাট বিছানা মশারি সবকিছুই আছে। জল কল ও বাথরুমের ব্যবস্থাও ভাল। এই বাড়িতে এসেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমরা। হোক ভূতের বাড়ি, তবু বাড়ি তো! শান্তিতে থাকা যাবে। এই বাড়ি এবং ঘর যেন আমাদের সুখের স্বর্গ বলে মনে হল।

আমরা দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় বসে বেশ মনের আনন্দে হইহুল্লোড় আরম্ভ করে দিলাম। মুন্না যতরকম হিন্দি সিনেমা দেখেছিল তার সব গান এক এক করে গাইতে লাগল।

প্রচণ্ড শীতের জন্য জানলা দরজা বন্ধই ছিল সব। এমন সময় মনে হল কে যেন বাইরে থেকে টকটক শব্দ করল জানলায়।

আমরা হট্টগোল থামিয়ে জানলা খুলেই দেখি এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকে স্মিত হাসছেন আমাদের দিকে চেয়ে।

"কাকে চাই?"

"কাকে আবার? আপনাদেরকেই। কতক্ষণ এসেছেন আপনারা ?"

"এই কিছুক্ষণ। কিন্তু আপনি কে?"

এবার আর আপনি নয়। 'তুমিতে নেমে এলেন বৃদ্ধ, "ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখো তো আমার মুখের দিকে, আমাকে চিনতে পারো কিনা? আমি তায়জু সারেং।"

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, "আরে, তায়জুদা! আসুন আসুন ভেতরে আসুন। আপনি যা দাড়ি রেখেছেন তাতে তো চেনাই যাচ্ছে না আপনাকে।" বলে দরজা খুলে দিলাম।

তায়জুদা আমাদের সিনিয়ার স্টাফ ছিলেন। বছর দুই হল রিটায়ার করেছেন। আমাদের আমন্ত্রণে ঘরের ভেতরে এসে বিছানায় বসে বললেন, "তারপর হঠাৎ কী মনে করে এখানে এসেছ তোমরা ?"

"আমরা খড়গপুর বেড়াতে এসেছিলাম তায়জুদা। কোথাও জায়গা না পেয়ে আজকের রাতটুকুর মতো এই বাড়িতে উঠেছি। কাল সকালেই চলে যাব। কিন্তু আপনি এখানে কেন ?"

"আমার বাড়ি তো এখানেই। পীরবাবায়। আজ একটা বিশেষ কাজে লাইনের ওপারে গিয়েছিলাম। এমন সময় সোমসাহেবের সঙ্গে দেখা। ওঁর মুখেই তোমাদের আসার কথা শুনলাম। তোমরা সব কীভাবে আছো না আছো তা একবার দেখেও আসতে বললেন। তবে বাবা এই বাড়িতে তোমরা এক রাত কী করে কাটাবে তা ভেবে পাচ্ছি না। এ বড় দোষাস্ত জায়গা। কবরখানার ওপর বাড়ি তো! ভীষণ উপদ্রব হয় এখানে। আমি সাহেবকে বললুম, এ আপনি ঠিক করেননি স্যার। আপনি জেনেশুনে ওদেরকে ওখানে পাঠালেন কী বলে? তা উনি তো এসব মানেন না। তাই বললেন, আরে ছেড়ে দাও তো। চার-চারটে ছোঁড়া রয়েছে। এক রাতের ব্যাপার। কে কী করবে ওদের? তবু বাবা আমি বুড়োমানুষ। সাহেব এসব না মানলেও আমি তো মানি। তাই বলছিলুম কি, তোমরা এখানে না থেকে বরং আমার বাড়িতে চলে এসো।"

আমি বললাম, "তায়জুদা, বাড়ি যখন আপনার কাছেই তখন আপনি নিজেই যদি এক রাত আমাদের কাছে থেকে যান, তা হলে খুব একটা খারাপ হয় কি? আপনার বাড়ি যখন এখানেই, তখন অসুবিধেরও কিছু নেই। আমরাও আপনাকে

পেয়ে বর্তে যাই। না হলে এই শীতের রাতে এমন একটা সুন্দর আস্তানা ছেড়ে কোথাও যেতে মন চাইছে না আমাদের।”

তায়জুদা বললেন, “তোমরা তো বললে ভাল। আমি নিজে যেখানে তোমাদের থাকতে মানা করছি সেখানে আমি কী করে থাকি ?”

“তা জানি না। যেভাবেই হোক, আপনি এখানে থেকে যান। প্লিজ।”

“তা হলে তো বাড়িতে একটু খবর পাঠাতে হয়।” বলে জানলার পাল্লাটা খুলেই এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে কাকে যেন চেঁচিয়ে ডাকলেন, “কামাল! এই কামাল!”

একটি অল্প বয়সের ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এই ভূতের বাড়ির ভেতর থেকে রাত্তিরবেলা তায়জুদাকে তার নাম ধরে ডাকতে দেখেই ভূত দেখার মতো ভয় পেয়ে তেড়ে দৌড় লাগাল সে।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

আমরা উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক।

“এ কী ! স্যার আপনি ?”

দেখি না সোমসাহেব নিজেই এসে হাজির হয়েছেন এই রাতদুপুরে। যা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। বললেন, “এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমাদের? তবেআগেই বলে রাখছি কারও কথায় কান দিয়ে না। ভূতপ্রেত কিছুই নেই এখানে সব বাজে কথা। আসলে এখানে একটা পুরনো কবরখানা ছিল। এখন সেটা আর ব্যবহার করা হয়না। তার একটা অংশ বিক্রি হওয়ার সময় আমার বোন ভগ্নিপতি খুব জলের দামে কিনে নেয়। তারপর বেশ মনের মতো করে এই বাড়িটাকে তৈরি করে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মনে একটু ক্ষোভ দেখা দেয়। সেইজন্য ওদেরই ভেতর থেকে কিছু লোক নানাভাবে ভয়টয় দেখায়, যাতে এখানে কোনও লোক রাত্রিবাস

করতে না পারে। আর এই তায়জুটা হচ্ছে একটা পাক্কা শয়তান। এই হচ্ছে ওদের দলের লিডার। এই সবাইকে উসকিয়ে ডেকে ডুকে আনে।”

তায়জুদা ফিক ফিক করে হেসে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, “হেঁ হেঁ। কী যে বলেন স্যার। আমি এই বুড়ো বয়সে...। আমার কি আর কোনও কাজ নেই? কেন মিছিমিছি আমার নামে বদনাম দিচ্ছেন?”

“থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। তুমি কী চিজ তা আমি জানি। ওইজন্যই এদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য তোমাকে পাঠালাম। একটু নজরে রেখো এদের। এক রাত থাকবে। যেন ভয়টয় দেখিয়ো না।”

আমি বললাম, “স্যার! তায়জুদাকে আমরা আজকের রাতটুকুর মতো এখানে থাকবার জন্য বলছি।”

“না। তোমরা নিজেরাই থাকো। পরের বাড়িতে বাইরের লোক কখনও থাকতে দিয়ো না। বাড়ি তো আমার নয়। কী ভাবতে কী ভাববে ওরা শেষকালে! তা ছাড়া রাতদুপুরে এই বুড়ো ভাম যখন নাক ডাকাতে শুরু করবে তখন ঘুমের বারোটা তো বাজবেই তোমাদের, উপরন্তু ওকেই হয়তো ভূত ভেবে ভয়ে কাঠ হয়ে যাবে।”

তায়জুদা বললেন, “না না। ঠিক আছে। আমি যাই। কোনও ভয় নেই। সাবধানে থেকে সব। একটা রাত বই তো নয়!” এই বলে চলে গেলেন তায়জুদা।

সাহেবও চলে গেলেন।

আমরাও আর বিলম্ব না করে চারজনেই শুয়ে পড়লাম একত্রে। ভূতের বাড়ি তো! তাই অন্ধকার না করে আলো জ্বেলেই শুলাম। আমরা শোওয়ার পর সবে একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছে এমন সময় হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের এক পরিত্রাহি চিৎকারে ঘোর ছুটে গেল আমাদের। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম চারজনেই। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? মনে হচ্ছে বাথরুমের ভেতর থেকে।

ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুললাম। দেখলাম কোথায় কী। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারটা যেন আরও বেড়ে গেল। সে কী দারুণ কান্না। একটানা চিৎকার যাকে বলে। আমরা কানে হাতচাপা দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল রেশটা।

এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকতে লাগল। "হাসান হাসান রে! এ হাসান।"

আমরা ছুটে গিয়ে জানলা খুললাম। কিন্তু কই? কোথায় কে? কেউ কোথাও নেই তো। এদিকে ঘরের কোণ থেকেও একটা চাপা আর্তনাদ কানে এল। কে যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, "হায় আল্লা ! কী কষ্ট! উঃ, মরে গেলাম।"

ঘরের মধ্যে আমরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। অথচ ঘরের কোণ থেকে ওইভাবে কার আর্তস্বর ভেসে আসছে? এক সময় দেখলাম ঘরের কোণের মেঝেটা কীরকম ঢিবির মতো উঁচু হয়ে উঠল। আর সেইসঙ্গে—ওরে আমার হাতে খুব লাগছে রে ও বাবা গো! আমার হাতের ওপর দিয়ে কে দেওয়াল তুলেছে। আমি হাত নাড়তে পারছি না।

ওপাশের দেওয়ালের গা থেকেও ওই একই রকম চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল— "ওগো, আমার বুকে ইট গেঁথেছে কে? ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা এগুলো ভেঙে দাও। এই দেখো আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

এই প্রচণ্ড শীতেও আমাদের সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটছে তখন। কী যে করব কিছু ঠিক করতে পারছি না। চারদিক থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। করুণ ক্রন্দনে ভরে উঠছে গোটা ঘর।

একটা কফিন কে যেন শুইয়ে রেখে গেছে। কিন্তু কে রাখল ? দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মুন্না ছুটে গিয়ে খিল খুলতেই দেখা গেল তায়জুদাকে। আমাদের অবস্থা দেখেই তায়জুদা বললেন, “ভয় নেই। আমি এসে গেছি। তোমাদের আগেই বলেছিলাম এখানে রাত্রিবাস করা যায় না। এ অত্যন্ত খারাপ জায়গা। তবুও তোমরা যেমন শুনলে না তেমনই ফল বোঝে।”

আমরা বললাম, “তায়জুদা, ওই দেখুন একটা কফিন। কে এসে রেখে গেছে ওখানে।”

সেদিকে তাকিয়েই রেগে উঠলেন তায়জুদা, “কে! কে এটাকে নিয়ে এসেছে এখানে ?”

“তা জানি না।”

“এটা তো ও ঘরের মেঝেয় পোঁতা ছিল।”

“তায়জুদা! কী বলছেন আপনি?”

“ঠিকই বলছি। দেখবে এসো।”

আমরা তায়জুদার সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সত্যি-সত্যিই সেখানে সিমেন্টের মেঝে খুঁড়ে কে যেন বের করে এনেছে কফিনটাকে।

তায়জুদা ছুটে গিয়ে কফিনের ঢাকা খুলে ভেতরটা দেখে নিয়েই বললেন, “হ্যাঁ, ঠিক আছে। চলো ওটাকে ও ঘরে আবার পুতে রেখে আসি।”

ততক্ষণে আমরা আর আমাদের মধ্যে নেই। কেননা তায়জুদা কফিনের ঢাকা খুলতেই দেখলাম তায়জুদার মৃতদেহটা কফিনে শোওয়ানো আছে। অবাক কাণ্ড! তা হলে আমাদের সামনে এই যে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ইনি তবে কে?

এমন সময় হঠাৎ সোমসাহেব এসে পড়লেন তাই রক্ষে! সোমসাহেব বললেন, “আবার তায়জুদ্দিনটা এইসব আরম্ভ করে দিয়েছে? ওর বদমায়েশি দেখছি এখনও গেল না! থাক। চলে এসো তোমরা। দারুণ ভয় পেয়েছ মনে

হচ্ছে। আমার ওইখানেই চলো। এই নাও চাবি। আমি সিনি যাচ্ছি। ওখানে ব্লক আছে। তোমাদের এখানে পাঠানোই আমার ভুল হয়েছিল।”

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোমসাহেবকে অনুসরণ করলাম। স্টেশনের কাছাকাছি এসে সোমসাহেব অন্ধকারে হেঁটেই ইয়ার্ডের দিকে চলে গেলেন।

আমরা সোমসাহেবের বাংলোয় যখন এসে পৌঁছলাম তখন শেষ রাত। সেখানে গিয়েই এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম। আজ বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন সোমসাহেব।

দুর্যোগের রাত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

১৯৬২ সালের কথা।

আমার বয়স তখন একুশ বছর। রেলে চাকরি পেয়ে মেদিনীপুরে আছি।

তখন বৈশাখের শেষ। প্রচন্ড গরমে হাঁসফাঁস করছি সকলে। তার ওপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে তুলি-খালাসির কাজ। মেদিনীপুর শহরের প্রান্তে কাঁসাই নদীর তীরে বাঁধের ওপর আমাদের তাঁবু পড়েছে। ব্রিজে স্ক্র্যাপিং হচ্ছে তখন। সারাটা দিন রোদে কাজ করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছি। হঠাৎ বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে একটা মেঘ এল।

আমাদের সঙ্গে ছিল গুণধর মেট। বলল, "ওরে বাবা! এ যে ঈশানে মেঘ, বৃষ্টি একটু হবেই।"

আমি বললাম,'হোন না! হলে তো বাঁচি। সারাটা দিন যা গেল, একটু যদি বৃষ্টি হয় তো স্বস্তি পাই।'

আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করছিল কাজের শেষে তাদের অনেকেই যে যার বাড়ি চলে গেল।

রইল শুধু গুণধর ও গোষ্ঠদা।

গোষ্ঠদা কার্পেন্টার। ব্রিজের কাজ তো, রেলের স্লিপারের কাঠে বিঁধ করতে, কাঠ ছাঁট করতে কাপেন্টার লাগে। সবসময়ই প্রয়োজন এদের। তা সেই গোষ্ঠদা ও গুণধর দুজনেই বাজারের থলি হাতে চলে গেল বাজার করতে।

নদীর ধারে নির্জন স্থানে তাঁবুর মধ্যে রইলাম আমি একা। কিছুতেই থাকতে চাইনি আমি। কেননা একে দুর্যোগের পূর্বাভাস, তার ওপরে ওই ভয়ঙ্কর নির্জনতা।

অথচ উপায়ও নেই। একজন অন্তত পাহারায় না থাকলে সর্বস্ব চুরি হয়ে যাবে। তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার একজন থাকে, তবে সে লোকটা আজ দুদিন হল অনুপস্থিত।

চৌকিদারের নাম জগাইদা। বড় ভালমানুষ। বয়স হয়েছে। আমাকে বলে, "এসব কাজ তোমাদের নয়। এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এ কাজ ছেড়ে কোনও অফিস টফিসে যাতে ঢুকতে পারো সেই ধান্দাই লাগাও দেখি।"

জগাইদা তো বলেই খালাস। কিন্তু অফিসের চাকরি আমাকে দেবে কে? তাই শুনেই যাই জগাইদার কথা। আর শতকষ্ট সহ্য করেও চাকরিটা বজায় রাখি। হাজার হলেও রেলের চাকরি তো!

যাই হোক, সবাই চলে গেলে একা আমি মনমরা হয়ে বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার শরীরের ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। বুঝলাম বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও।

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

তবুও কোনওরকমে আলোটা জ্বাললাম।

হঠাৎ ঝড় উঠল। প্রথমে গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ। তারপরই কড়কড় করে বজ্রপাত। আলোর চাবুক একটা দিক থেকে দিগন্তে ছিটকে গেল।

আমার যেন ডাক ছেড়ে কান্না এল তখন। সত্যি বলতে কি, এই ভয়ঙ্কর নির্জনে আমার তখন ভূতের ভয় করতে লাগল খুব। যত রাগ হল আমার গুণধর ও গোষ্ঠদার ওপর। আমাকে এইভাবে একা রেখে ওদের চলে যাওয়াটা কি উচিত হল? আসলে বাজার করতে যাওয়াটা ওদের অছিলা। ওরা গেল নেশা করতে। বাজার হয়তো করবে। কিন্তু আজ তা না করলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। এখন আমি একা এখানে কী করি? এই নির্জনে ভূতের ভয়, সাপের ভয়, সবকিছুই পেয়ে বসল আমাকে।

এই দুঃসময়ে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। এমনকী এও ঠিক করলাম, এই চাকরি আর নয়! কাল সকাল হলেই পালাব। গার্ডেনরিচের কর্তাদের বলব শালিমারে পোস্টিং দেন তো ভাল, না হলে ইস্তফা।

আমার এইসব চিন্তাভাবনার মধ্যেই দেখি না টর্চ হাতে কে যেন একজন দ্রুত আমার দিকে ধেয়ে আসছে। শুধু আসছে নয়, আমার নাম ধরেও ডাকছে।

আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি না জগাইদা। জগাইদা রক্তচক্ষুতে বললেন, "শয়তান দুটো কোথায় রে?"

বললাম, 'ওরা তো বাজারে গেছে।"

"বাজারে গেছে? এই নির্জনে তোকে একা রেখে? তার ওপর এই দুর্যোগ। আমি না থাকলেই দেখি ওদের সাহস বেড়ে যায় খুব।"

"কিন্তু জগাইদা! তুমি এই দুদিন কোথায় ছিলে?"

"আর বলিস না ভাই। গিয়েছিলুম একটু মেয়ের বাড়ি। তা সে কী বিপদ— যাক সে কথা। আমি যখন এসে গেছি তখন তোর আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু এইখানে এক মুহূর্তও থাকিস না আর।"

"কেন জগাইদা ? এই অন্ধকারে যাব কোথায় আমি ?"

"চল, তোকে আমার পরিচিত একজনদের বাড়িতে রেখে আসি। এই পরিস্থিতিতে মাঠের মাঝখানে কি পড়ে থাকা যায়? তা ছাড়া আকাশের যা অবস্থা তাতে ঝড় এখনই উঠল বলে! একটু পরে তাঁবু টাবু কোথায় থাকবে তা কে জানে?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণ একটা ঘূর্ণিঝড় হঠাৎই ধুলোবালি উড়িয়ে চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপরই দেখি বাঁধের ওপর আমরা দু'জন। কিন্তু তাঁবু উধাও।

এরপর নামল বৃষ্টি। জগাইদা ভিজে-ভিজেই আমাকে নিয়ে এলেন এক গোয়ালার বাড়িতে। এসে হাঁকড়াক করতেই বাড়ির লোকজন বেরিয়ে এল। জগাইদার বিশেষ পরিচিত এঁরা। জগাইদা বললেন, "আজ রাতটুকুর মতো এই ছেলেটাকে তোমাদের বাড়িতে একটু আশ্রয় দাও দিকিনি। ভদ্রলোকের ছেলে। ওইরকম ফাঁকা জায়গায় এই দুর্যোগে থাকতে পারে কখনও?"

আমি তো আশ্রয় পেলাম। কিন্তু জগাইদা ?

বললাম, "জগাইদা, তুমি কোথায় যাবে? তাঁবুর তো চিহ্ন নেই। তার ওপর এইরকম ঘন ঘন বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।"

জগাইদা বললেন, "হোক। আমি যে চৌকিদার। এইটাই তো আমার ডিউটি ভায়া। না হলে রেলের অত দামি দামি যন্ত্রপাতি, একটু চোখের আড়াল হলে ওর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না আর।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু ওই দুর্যোগে তুমি থাকবে কী করে?"

"আমার জন্য চিন্তা করিস না। আমরা হচ্ছি জল-কাদার মানুষ। এসব আমাদের গা সওয়া।"

আমি সে রাতে ওই গোয়ালার বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে সত্যিই বেঁচে গেলাম। ওদের বাড়িতে পোস্তর তরকারি, মৌরলা মাছের টক আর পেটভরে ভাত খেয়ে আরামে শুলাম বটে কিন্তু জগাইদার চিন্তায় আমার ঘুম হল না। কেননা জগাইদা চলে যাওয়ার পর দুর্যোগ আরও প্রবল রূপ ধারণ করল। ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল আমার।

ভোরবেলা সবে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি এমন সময় গুণধর ও গোষ্ঠদার ডাকে ঘুম ভাঙল। দুর্যোগ কাটলেও অন্ধকার তখনও কাটেনি। একেবারেই নিশিভোর যাকে বলে। গুণধর বলল, "শোন, আমরা স্টেশন ধারে যাচ্ছি জগাইদাকে

দেখতে। তুই সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাক। বেলায় একবারে শ্মশানে চলে যাবি।”

চমকে উঠলাম আমি, “সে কী ! কেন ?”

“মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে জগাইদা সাপের কামড়ে মারা গেছে। একেবারে জাত কেউটেয় কেটেছে জগাইদাকে। বুঝলি, দারুণ বিষ তীর।”

আমার সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ওদের কথা যদি সত্যিই হয় তা হলে কাল সন্ধেবেলা কে আমাকে এই বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেল ?

আমি সকাল হতেই গোয়ালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে আমাদের সেই কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সেখানে অনেক লোকজন। আমাদের কুলি-খালাসিরাও আছে।

সবাই বলল, “আমরা তোমার কথাই ভাবছিলাম গো। কী দুর্যোগই না গেল কাল। তিন-তিনজন সহকর্মীকে হারালাম। জগাইদা তো মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে সাপের কামড়ে মরল। গুণধর আর গোষ্ঠ মরল ফাঁকা মাঠে বজ্রাঘাতে।”

“কখন ?”

“কাল সন্ধেবেলা, নেশা করতে গিয়ে।”

আমার তো হাত-পা তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এমনও নাকি হয়? আমি আর এক মুহুর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে স্টেশনের পথ ধরলাম।

সেই শেষ।